বিতর্ক ▸▸ মনের খবর ▸▸ কেরিয়ার কাউন্সেলিং ▸▸ ক্যাম্পাস

আনন্দমেলা

২০ এপ্রিল ২০০৩ দশ টাকা

টিনএজারদের আজ-কাল-পরশু

সম্পূর্ণ রঙিন

সাহিত্যে ডিটেকটিভ



বাংলা গোয়েন্দা গল্পের বিবর্তন

ইংরেজি সাহিত্যের কয়েকজন নামকরা গোয়েন্দা

জমজমাট ডিটেকটিভ গল্প

দেবতার হাত

পশুরা যখন সেলিব্রিটি

কলকাতায় নতুন খেলা বেসবল

নিক্কো পার্কে সাইক্লোন

সমরেশ মজুমদারের ধারাবাহিক উপন্যাস কেউ বোঝে না



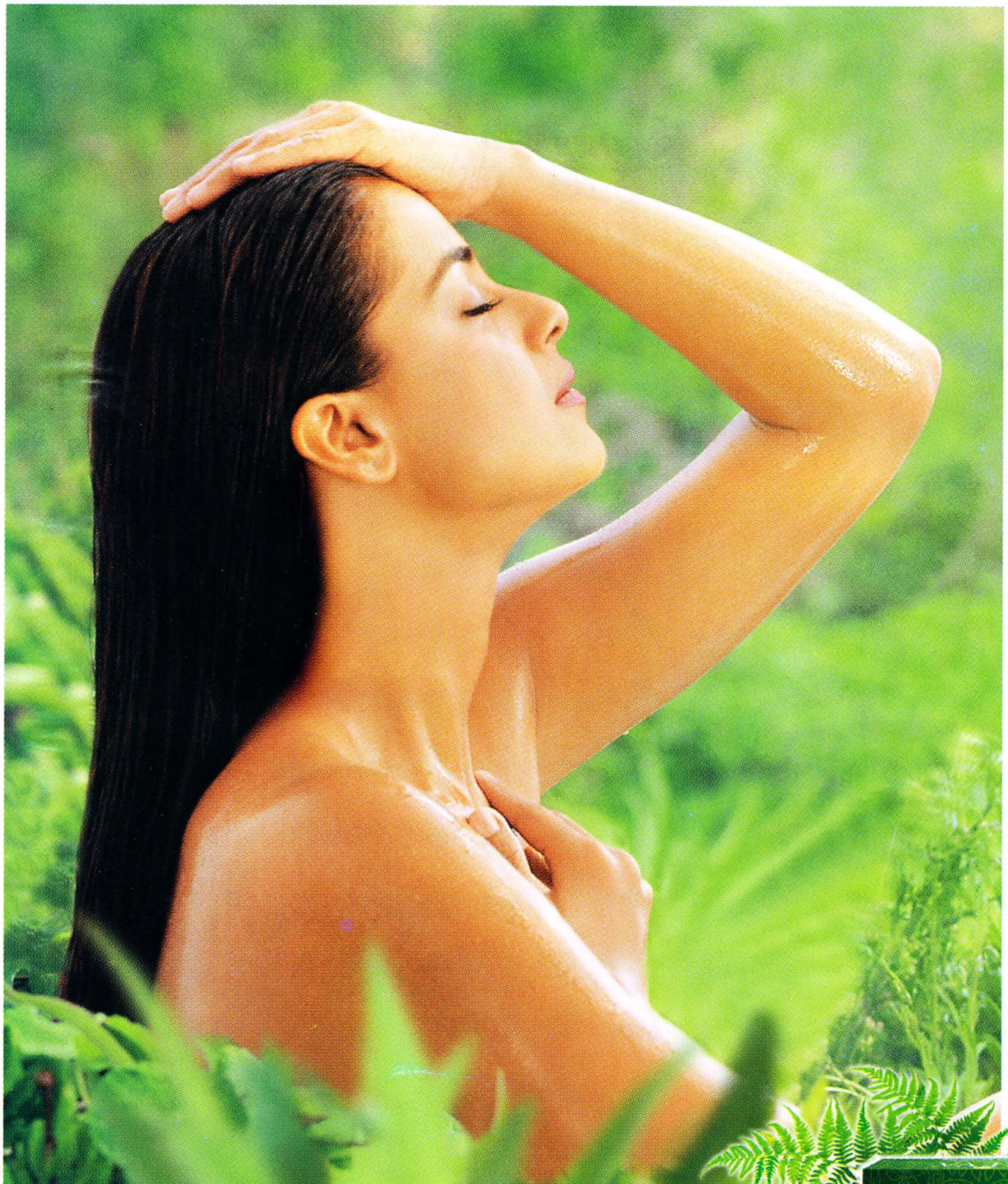
Hard Copy & Scan - Wolverine
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

জীভা - আয়ুর্বেদের
২৭ টি গুণ,
ত্বক উজ্জ্বল,
কোমল, তরুণ



ত্বকের প্রাণ
২৭

আয়ুর্বেদের বাছাই করা
সাতাশটি গুণ

উগ্রগন্ধা
শতপুষ্ম
প্রভদ্র
ব্রাহ্মী
দেবদারু
জ্যোতি ষ্মতি
নারিকেল
গুগুল
ধান্যক
দারুহরিদ্রা
হীরক
বনহরিদ্রা
এলা
বিদঙ্ঘ
মধুরিকা
মধুক
সারিবা
কূটজা
কর্পুর
কৃষ্ণজীরক
বাকুচি
রক্তচন্দন
চিত্রক
মধুস্নূহী
আদ্রক
অজমোদা
ভূনিম্ভ

জীভা। আপনার ত্বক হয়ে ওঠে সাতাশ গুণ বেশি সুন্দর। জীভায় আছে আয়ুর্বেদের এমন সাতাশটি ভেষজের নির্যাস যা আপনার ত্বককে করে সুরক্ষিত, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল। এর কোমল ফেনা রোমকূপের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে। আপনার ত্বককে দেয় তরতাজা তারুণ্য, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। আর ত্বকের জন্য আনে এক নতুন প্রাণ।



প্রতিটি স্নান। ত্বকের জন্য নতুন প্রাণ।

From the house of Jyothy Laboratories Ltd. Shivshakti Estate, Marol, Andheri (E), Mumbai - 59.

Situations/JLL-JEEVA/05/2003 Ben

২৯ বর্ষ ১ সংখ্যা ৬ বৈশাখ ১৪১০ ২০ এপ্রিল ২০০৩

আনন্দমেলা

অন্যান্য পাতায়

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

গ ল্প

খে লা ধু লো

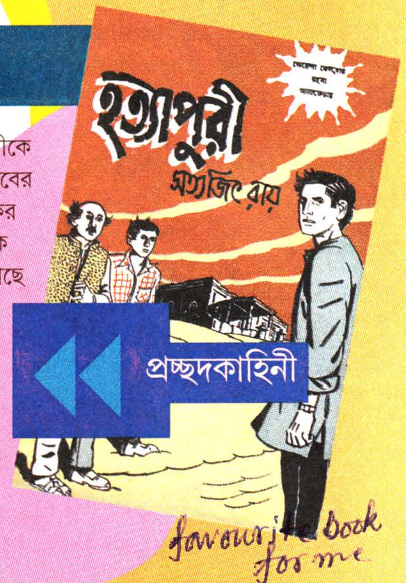
প্রচ্ছদ: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সৌজন্যে

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক: অভীক সরকার।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা ২০ পয়সা। কাঠমাণ্ডু এবং পোর্ট ব্লেয়ার ৩০ পয়সা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

সাহিত্যে ডিটেকটিভ

৮

▶▶একের পর এক রহস্যের আড়াল সরিয়ে অপরাধীকে চিহ্নিত করা, মাথা খাটিয়ে রহস্যের অনুসন্ধান — বাস্তবের ডিটেকটিভদের চেয়ে অনেক বেশি নাটকীয় আর রোমাঞ্চকর গল্পের গোয়েন্দাদের কাজকারবার। মুখে পাইপ নিয়ে শার্লক হোম্‌স বা চারমিনার ঠোঁটে ফেলুদা — আমাদের মনের কাছে তাঁদের আবেদন একই রকম। খুব সাধারণ জিনিসের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তাঁরা বলে দিতে পারেন, অপরাধী কী কী সূত্র ফেলে গিয়েছে তার মধ্যে। কী বিদেশি সাহিত্যে, কী বাংলায়, সর্বত্রই তাই গোয়েন্দাদের বিশাল উপস্থিতি, বিপুল জনপ্রিয়তা। এবারের প্রচ্ছদকাহিনী তাঁদের নিয়েই। বাংলা সাহিত্যের নামকরা গোয়েন্দাদের নিয়ে লিখেছেন **শোভন তরফদার**। বিদেশি সাহিত্যের গোয়েন্দারা হাজির **চন্দন সাউয়ের** লেখায়।



প্রচ্ছদকাহিনী

আনন্দমেলা টিনঠেক

৪০



▶▶ এবারের 'আনন্দমেলা'র আড্ডা বসেছিল আশুতোষ কলেজের ঘরে। এক দঙ্গল টিনএজার ছেলেমেয়ের সঙ্গে আড্ডায় হাজির ছিলেন গায়িকা নীপবীথি ঘোষ এবং বাংলা ব্যান্ড 'চন্দ্রবিন্দু'-র অন্যতম লিড গায়ক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। আজকের টিনএজার এবং তাদের বাবা-মায়ের মধ্যে সমস্যার বড় একটা কারণ হল জেনারেশন গ্যাপ। ছেলেমেয়েদের চিন্তাভাবনা স্বাভাবিকভাবেই তাদের বাবা-মায়ের চেয়ে আলাদা। তা হলে কতটা নিয়ন্ত্রণ ছেলেমেয়েরা মেনে নেবে? এই নিয়ে জমে উঠেছিল বিতর্ক। শেষে ছিল জমজমাট কুইজ কনটেস্ট। লিখেছেন **মনীষা দাশগুপ্ত**।

অফবিট

পশুরা যখন সেলিব্রিটি

৩৭



▶▶ "কুকুর বলে কি মানুষ নই?" টিনটিনের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছিল বিরক্ত কুট্টুস। তার এই কথার সমর্থনেই হাজির তারকা হয়ে ওঠা পশুপাখিরা। অনেক সময়েই মানুষের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছে তথাকথিত 'মনুষ্যেতর' প্রাণীরা। কুকুর নিপার-লাইকা-পিক্‌লস, তিমি কিকো, ভেড়া ডলি, সিংহ লিও-মার্জানদের কথা লিখেছেন **অভিজিৎ সুকুল**।

ডাক বাক্স

টিনএজাররা সবসময় চায় নতুনত্ব

২০ মার্চ 'আনন্দমেলা'য় সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিনএজার সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি ভাল লাগল। এ-সম্পর্কে আমারও দু-একটি কথা বলার আছে। একজন টিনএজার হিসেবে আমার মনে হয়, আমরা এই বয়সে সবকিছুই পেতে চাই। আমাদের মনে হয়, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের এটাই সবচেয়ে ভাল সময়। স্বাধীন হয়ে মন খুলে আকাশে অদৃশ্য ডানা দুটো মেলে দিতে চাই। কিন্তু আমরা কখনওই বাস্তব থেকে হারিয়ে যাই না। পিছিয়ে পড়ি না। আসলে আমরা একটু বেশি ভবিষ্যৎ সচেতন। তাই ব্যস্ততা এবং নিষ্ঠুর বাস্তবের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা আমরাই করে নিয়েছি। সত্যি বলতে কি, বাড়িতে যেহেতু আমাদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না, একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়। এই একাকিত্বের ব্যাপারটা আমরা বাইরের পরিবেশের থেকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করি। তাই আমরা বেশি বন্ধুত্ব করতে চাই। বাড়ি থেকে আমরা কম উৎসাহ পাই বলে বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই আমাদের চিন্তাভাবনাগুলো শেয়ার করি। যে-কোনও বিষয়েই নিজের মন্তব্য প্রকাশ করে বাইরের জগতের কাছ থেকে নিজের গুরুত্ব আদায় করতে চাই।

আর পুলিপিঠের কথা বললে তো, আমাদের ক'টা বাড়িতে এখন বছরে নিয়ম মেনে পুলিপিঠে বা পুজোর আগে নাড়ু-মিঠাই হয়, বলতে পারেন? এই চাহিদা মেটাতে গেলে তো এখন আমাদের দোকানে ছুটতে হয়। আর সময়ের সঙ্গে রীতিরেওয়াজগুলো আমাদের বাড়িতে মানা হয় না। আমরা টিনএজাররা নতুন করে আর কী মানব? তাই ফাস্ট পৃথিবীর ফাস্ট যুগে ফাস্টফুডই আমাদের শ্রেয়। পিৎজাতেই তৃপ্তি বেশি।

পোশাকের কথা বলতে গেলে, ব্যস্ততার এই যুগে বাইরের পরিবেশে চলার জন্য যে পোশাকে আমরা বেশি স্বচ্ছন্দ, সেই পোশাকই ব্যবহার করি। কোনও বেমানান পোশাক কিন্তু আমরা পরি না। আমাদের পোশাক যথেষ্ট রুচিসম্মত। আমাদের নানা ভাষার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাই আমরা হিন্দি বা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতে বাধ্য হই।

টিনএজার সম্বন্ধে মনোবিদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়। আমিও সে-বিষয়ে একমত। মনোবিদদের মতামতও গ্রহণীয়। টিনএজাররা সবসময় চায় নতুনত্ব। সমাদর করে আধুনিকতাকে। ডিস্কো, র‍্যাম্প, এম টিভিতে টিনএজাররা প্রাণবন্ত, প্রাণোচ্ছল। তবে এগুলোর পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত, কবিতা, ভাল সিনেমা, ভাল গল্প— এগুলোও নতুন প্রজন্মের কাছে সমান সমাদর পায়।

পারমিতা চট্টোপাধ্যায়

বি এসসি, আই টি

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সফ্টওয়্যার টেকনোলজি

সল্ট লেক, কলকাতা

দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা

আমি আনন্দমেলার প্রতিটি লেখাই মন দিয়ে পড়ি। এই পত্রিকাটি আমাদের মতো কিশোরদের প্রকৃত বন্ধু। তবে ২০ মার্চ সংখ্যার 'চলতি হাওয়া' বিভাগে সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

টিনএজারদের ভবিষ্যৎ নিয়েও সহেলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু ভাবা প্রয়োজন। আধুনিকতা বলতে তিনি কি শুধু পাব, কোক, ডিস্কো আর আড্ডাই বোঝেন? তিনি টিনএজারদের 'যা মন চায়, তাই করুক'— এই পরামর্শ দিয়েছেন। কোনও দায়িত্বশীল মানুষই এই বক্তব্য সমর্থন করবেন না। নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়া ছাড়াও টিনএজার ছাত্রদের দেশ ও সমাজের প্রতি কিছু দায়বদ্ধতা আছে। কিশোর কিশোরীদের স্বাধীনতা নিশ্চয়ই দিতে হবে কিন্তু তা উচ্ছৃঙ্খলতার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার এই প্রচেষ্টা কেন? কোনও পিতামাতাই চাইবেন না যে তাঁদের ছেলেমেয়েরা বিদেশি টিভি চ্যানেলের উচ্ছৃঙ্খল যৌন উদ্দামতা দেখুক এবং ডিস্কো ঠেক-এ গিয়ে তা বাস্তবায়িত করুক। ঋত্বিকমার্কা শার্ট পড়লেই যে ঋত্বিক হওয়া যায় না, তা জানা সত্ত্বেও তিনি টিনএজারদের বার-এ যাওয়ার যে দুঃসাহসিক স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং অনুপ্রাণিত করেছেন, তাতে টিনএজারদের সমূহ বিপদেরই আশঙ্কা। তাই আমার অনুরোধ আনন্দমেলায় ভবিষ্যতে এইরকম লেখা প্রকাশিত না হলেই ভাল।

গৌতম সরকার

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল

আমি আনন্দমেলার নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকার প্রতিটি লেখাই আমার খুব ভাল লাগে। আমি বারমুডা ট্রায়াঙ্গল রহস্য সম্বন্ধে জানতে চাই। এই সম্বন্ধে কয়েকটি বইয়ের নাম এবং বই ছাড়া আর অন্য কীভাবে এই বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারি তা জানালে বাধিত হব।

দেবব্রত বসু

দমদম, কলকাতা

সম্পাদকীয় উত্তর: বারমুডা দ্বীপ উত্তরে, পশ্চিমে ফ্লোরিডা আর দক্ষিণ-পূর্বে পুয়ের্তো রিকো। এই তিন শীর্ষবিন্দু কাল্পনিক এক রেখা দিয়ে যোগ করলে পাওয়া যাবে একটি ত্রিভুজ। এই কাল্পনিক ত্রিভুজই বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। বহু জাহাজ, নৌকো, এরোপ্লেন হারিয়ে গিয়েছে এখানে। 'আনন্দমেলা' ৬ অগস্ট ২০০২ সংখ্যায় 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্য' নামে একটি প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটিতে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। এ ছাড়া এই বিষয়ে বিখ্যাত বইগুলির নাম—চার্লস বারলিট্জ-এর 'দ্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গল', লরেন্স ডেভিড কুসচে-র 'দ্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গল মিস্ট্রি সলভড', জন ওয়ালেশ স্পেনসার-এর 'লিম্বো দ্য লস্ট'। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নিয়ে অনেক ভাল ওয়েবসাইট আছে। সেগুলির নাম— www.parascope.com/en/bermuda1.htm,www.byerly.org/bt.htm, www.bermuda-triangle.ors এবং www.history.navy.mil/faqs/faq8-1htm

'আনন্দমেলা'য় এখন নিয়মিত প্রকাশিত হয় পাঠকদের চিঠিপত্র। পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পারো 'ই-মেল'-এও।

ঠিকানা:

anandamela@ abpmail.com

পাঠকের পাতা

তুমি যেমন

সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়
বি. এসসি, প্রথম বর্ষ
বঙ্গবাসী ইভনিং কলেজ
কলকাতা

গভীর শ্যাওলার আড়ালে লুকিয়ে থাকা হৃদয় দেখা যায়,
কুয়াশা ভেজা আয়নায় ভেসে ওঠে অন্য কোনও মুখ
যেখানে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বচ্ছ বরফের মতো
উপত্যকায় ছড়িয়ে আছ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে!

তুমি আসবে বলে

সঞ্চয়িতা বিশ্বাস
নবম শ্রেণী
বসিরহাট হরিমোহন দালাল
উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগনা

তুমি আসবে বলে
অপেক্ষা করছিল আসমুদ্র হিমাচল।
তুমি আসবে বলে
অপেক্ষা করে ছিল সাধারণ থেকে অসাধারণ,
সদ্যোজাত শিশু থেকে মৃতপ্রায় বৃদ্ধ—সকলেই।
তুমি আসবে বলে
দেশে দ্বিতীয়বার হোলি আর দেওয়ালি শুরু হয়েছিল।
তোমার শুভাগমনের জন্য
ফুলের তোরণ দিয়ে সাজানো হয়েছিল সারা দেশ।
তুমি প্রথম এসেছিলে কুড়ি বছর আগে।
কুড়ি বছর পরে তোমার পুনরাগমনের জন্য
উন্মুখ হয়ে ছিল আপামর জনতা।
কিন্তু—
ভারত মহাসাগরের ঢেউয়ের
হাতছানিকে উপেক্ষা করে
তুমি পাড়ি দিলে ক্যাঙারুর সঙ্গে।
উপমহাদেশের প্রত্যাশাকে বিসর্জন দিয়ে
দক্ষিণ গোলার্ধের পথে চলে গেলে তুমি।
একশো কোটির আনন্দাশ্রু
বিষাদ-অশ্রুতে পরিণত করলে তুমি একাই।
কুড়ি বছরের প্রতীক্ষার যে বন্ধ দরজা
একটু একটু করে খুলে যাচ্ছিল
তুমি এক ধাক্কায় তা বন্ধ করে দিলে।
শুধু বলে গেলে একটি কথা—
" আবেগ নয়, বেগ দিয়ে আমায় জয় করো।"

যেদিন তোমায় প্রথম দেখি

মামুন হাসান
দশম শ্রেণী
লালবাগ সিংঘী উচ্চতর বিদ্যালয়
মুর্শিদাবাদ

যেদিন তোমায় প্রথম দেখি
সারাটা রাত জেগেই ছিলাম,
সারাটা রাত জেগে শুধুই
তোমার কথা ভেবেছিলাম।

যেদিন তোমায় প্রথম দেখি
লেখাপড়ায় মন ছিল না,
অঙ্ক বইটা সামনে খোলা
হাতের কলম সরছিল না।

যেদিন তোমায় প্রথম দেখি
প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম,
জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে
গাছের ডালে চড়েছিলাম।

যেদিন তোমায় প্রথম দেখি
তোমার গায়ে বালুচরি,
আজ সন্ধ্যায় বকুলতলায়
দেখা করো মনের পরি।

সাদা বক আর আমার প্রেম

বিদ্যুৎকুমার মৈত্র
বি. এসসি, দ্বিতীয় বর্ষ
কৃষ্ণনাথ কলেজ
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

খাতার পাতায় সাদা বক এঁকেছিলাম
মনের প্রতিক্রিয়া জানাতে—
গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম
যেখানে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা হয়
চাঁদের আলোয়,
আত্মনাশ করার সাহসিকতা দেখাতে চাই না
গোলাপ কাঁটায়, রক্ত যদিও মুচকি হাসে।

কবিতা ভিজে যায়
গঁদের আঠায়, নীল থেকে লীন হয়ে
বৃত্তপথে খামের ভিতর
জেগে উঠেও স্থির হয়ে যায়
সাদা বক আর আমার সদ্য উড়তে জানা প্রেম!

একা

মৌসুমী কর্মকার
দশম শ্রেণী (মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী)
আগরপাড়া সাবিত্রী মহাজাতি
বালিকা বিদ্যালয়
উঃ ২৪ পরগনা

এখন শুধুই একলা বসে থাকা
চোখের সামনে আবছা দিনের আলো
সাদা পাতায় ধূসর ছবি আঁকা
কিছুই যে আজ লাগছে না আর ভাল।

ডাকবে না আর সকালবেলার পাখি
বইবে না আর শান্ত হিমেল হাওয়া
স্মৃতি বোধ হয় হঠাৎ দেবে ফাঁকি
অন্ধকারে আলোয় ডুবে যাওয়া।

জীবন মানে চোখের জলের নদী
সেই নদীতেই উঠবে ভেসে চর
সেই চরেতে থাকবে শুধুই স্মৃতি
সেই স্মৃতিতেই বাঁধবে সবাই ঘর।

এই পৃথিবী এক নিমেষেই স্থির
থাকব না আর ভিড় বাড়ানোর দলে
ভিড়ের মধ্যে দেখবে যেদিন ভিড়
জানবে আমি ভাসছি চোখের জলে।



ব্রাজিলের আদিম জনজাতি ফোটো: এ এফ পি

পূর্বপুরুষ রহস্য

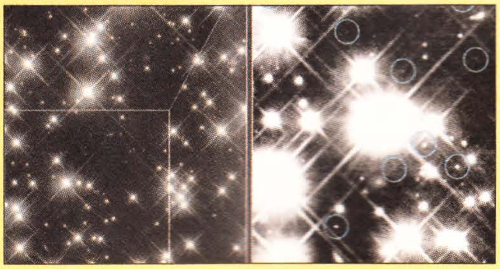
➤➤ব্রাজিলের মানুষের পূর্বপুরুষ কে? চোখমুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিলের 'ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ মিনাস গেরাইস'-এর সেরগিও পেন আর তাঁর সহকর্মীরা ৪০০ মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। চোখমুখের তফাত দেখেই তাদের জিন আলাদাভাবে পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা। শুধু চোখমুখের তফাতই নয়, ফরসা, কালো, লম্বা, বেঁটে মাঝারি চেহারা সেইসঙ্গে গায়ের রং নিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছিল। এইসব দেখেই আফ্রিকার আর ইউরোপের মানুষদের আলাদাভাবে চেনা যায়। কিন্তু ব্রাজিলের মানুষদের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যায় পড়েছিলেন বিজ্ঞানী পেন। এমনকী যাঁরা ভীষণই ফরসা কিংবা কালো, তাঁদেরও ওভাবে আলাদা করা যায়নি। আফ্রিকা কিংবা ইউরোপের মানুষদের সঙ্গে কাউকেই সবদিক দিয়ে ঠিকঠাক মেলানো যায়নি। ফলে ব্রাজিলের মানুষের পূর্বপুরুষ কারা, তা বুঝে উঠতে হিমশিম খেয়ে গেছেন বিজ্ঞানীরা।

পপুলার সায়েন্স

রোবোডগ 'আইবো'



➤➤মাথা তুলে তাকাল আইবো। কয়েকবার লেজ নাড়াল এদিক-ওদিক। ডাকল ঘেউ ঘেউ করে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে বেঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙল। একটা লাল বল গড়িয়ে যাচ্ছিল মেঝের উপর দিয়ে। বলটা দেখতে পেয়েই দৌড়ে গেল ধরবে বলে। সামনের পা তুলে থাবা দিয়ে ঠেলা মারল বলটায়। গুঁতোল মাথা দিয়ে। কে বলবে ও সত্যিকারের কুকুর নয়, রোবোডগ! বেশ কয়েকবছর আগেই সোনি কর্পোরেশন তৈরি করেছে একে। আইবো যে কত কাজ করতে



মহাবিশ্বের সঠিক বয়স

➤➤ঠিক কবে সৃষ্টি হয়েছিল মহাবিশ্ব? বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছেন এই নিয়ে। সম্প্রতি নিশ্চিতভাবে জানা গেছে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স। ১৩.৭ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের জন্ম। পৃথিবী থেকে ১৬ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থাকা একটি স্পেসক্র্যাফ্‌ট জানিয়েছে এই খবর। নাসার গবেষকরা বলছেন, বিং ব্যাং-এর প্রায় ১০ কোটি বছর পরে আকাশময় ছড়িয়ে পড়েছিল অগুনতি নক্ষত্র। সৃষ্টির সেই উষাকাল ছিল একেবারে শূন্য। ছিল না কোনও মহাজাগতিক বস্তুর চিহ্নমাত্র। গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি—কিছুই সৃষ্টি হয়নি তখন। বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা উত্তাপের অতি নগণ্য পরিবর্তন হয়েছিল, যার পরিমাপ এক ডিগ্রির ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। 'উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ অ্যানিসোট্রোপি প্রোব' (ডব্লিউ এম এ পি) গবেষণা চালিয়েছিল বিং ব্যাংয়ের ৩০৮০০০ বছর পরের পৃথিবী নিয়ে। বিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশের বিশ্বাস, ঠিক এই সময়ই নাকি জন্ম ব্রহ্মাণ্ডের। **ফোটো: এ এফ পি**

মৌমাছিদের শীত



ফোটো: আশিস সেনাপতি

➤➤একটু বেশি শীত পড়লেই জড়সড় হয়ে পড়ে পশুপাখিরা। গুটিসুটি মেরে থাকে। অস্ট্রিয়ার 'ইউনিভার্সিটি অফ গ্রাজ'-এর বিজ্ঞানী আন্তন স্তাবেনদাইন আর তাঁর সহকর্মীরা গবেষণা চালাচ্ছেন মৌমাছিদের নিয়ে। শীতকালে মৌমাছিরা গাদাগাদি করে এক জায়গায় থাকে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, মৌমাছিরা যখন কুণ্ডলির বাইরে থাকে তখন শরীরটা বেশ ঠান্ডা হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, উড়ে চলার জন্য যে পেশিগুলো দরকার সেগুলো গুটিয়ে রাখার ফলে শরীর বেশ গরম থাকে। আর এই উত্তাপ বাইরে বেরিয়েও আসে, ফলে চারপাশটা বেশ গরম থাকে। মৌমাছিদের শরীর গরম রাখার এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

মার্কারি ল্যাম্প থেকে বিপদ

➤➤বিপদে পড়েছেন আমেরিকার মার্কারি ল্যাম্প-এর প্রস্তুতকারকরা। কারণ ল্যাম্পে ব্যবহৃত পারদ নাকি ভয়ানক বিষাক্ত। পারদ যে কতটা ক্ষতি করতে পারে তা আমাদের অনেকেরই ধারণা নেই। পরিবেশবিদদের মতে মারাত্মক ক্ষতি করে এই তরল ধাতু। এই কারণেই আইন করে থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারমোন্ট প্রদেশে। মার্কারি ল্যাম্পের ক্ষতির দিকগুলো বোঝানো হচ্ছে মানুষজনকে। যে কোনও জায়গায় এই ল্যাম্প যেন ভেঙে ফেলা না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা হচ্ছে। পরিবেশবিদদের মতে পৃথিবীর সব দেশেই মার্কারি ল্যাম্প সম্বন্ধে এরকম ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পারে, তা জানলে অবাক হতে হয়। খবরের কাগজ বিক্রেতা এলে কাগজটি মুখে করে এনে দেয় মালিকের হাতে। খবর পড়েও শোনাতে পারে আইবো। কী করে? এই রোবোডগ সরাসরি ইন্টারনেটে সংযোগ করে মালিকের পছন্দমতো চার পাঁচটি সংবাদপত্র ডাউনলোড করে নির্দেশমতো প্রয়োজনীয় খবরগুলি বেছে বেছে পড়ে দেয়। চাইলে ই-মেলও শুনিয়ে দেয় আইবো। আইবোর পুরো নাম 'আর্টিফিশিয়ালি ইন্টেলিজেন্ট রোবট'। আইবোর মধ্যে আছে ৩৮৪ মেগাহার্জ ক্ষমতার মাইক্রোপ্রসেসর। এর সাহায্যে সে ওঠা-বসা, হাঁটা, লেজ নাড়ানো, কুকুরের মতো ডাকা, আড়মোড়া ভাঙা, থাবা তোলা ইত্যাদি নানা কাজ করতে পারে।

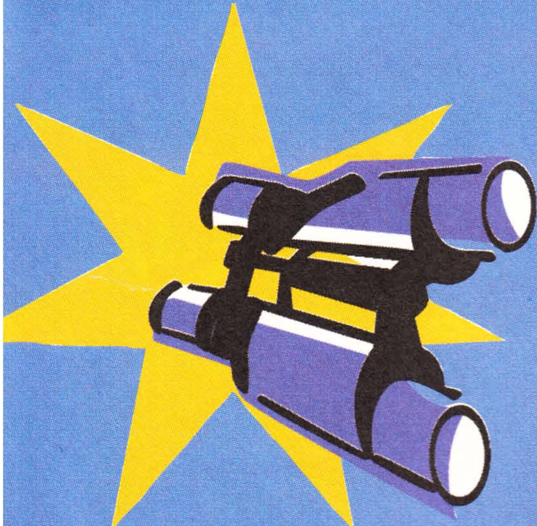


আইবোকে আরও উন্নত সফটওয়ারের মাধ্যমে নানারকম ট্রেনিং দিচ্ছেন একজন গবেষক। যেমন লাল রঙের বল চেনা এবং তার পিছনে দৌড়নো। আইবোর দেহের নানা অংশে, যেমন, কান, থুতনি, পা য়ের থাবা ইত্যাদিতে আছে 'প্রেশার সেন্সর', সামান্য চাপেই যা উত্তেজিত হয় এবং সেই বৈদ্যুতিক সাড়া চলে যায় তার যান্ত্রিক মস্তিষ্কে। এই মস্তিষ্কটিই যন্ত্রটির কেন্দ্রীয় প্রসেসিং ইউনিট (সি পি ইউ)।

আইবোকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। কুকুররা কীভাবে পরস্পরকে চিনতে পারে, তার রহস্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। জীবন্ত একটি কুকুর আইবোকে স্বজাতি ভেবে ভুল করেছে, একটি পরীক্ষায় তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষাটি এইরকম— একটি লাল রঙের পাত্রে কিছুটা মাংস রেখে আইবো এবং একটি বেলজিয়ান কুকুরকে ছেড়ে দেওয়া হল। আইবো পাত্রটির দিকে এগিয়ে গেল। মাংসের লোভে নয়, ওই পাত্রের লাল রঙের আকর্ষণে। কারণ লাল রং তার চেনা। বেলজিয়ান শেফার্ডও পাত্র লক্ষ করে দৌড়ল, অবশ্যই মাংসের আকর্ষণে। পাত্রটির সামনে আইবোকে দেখেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

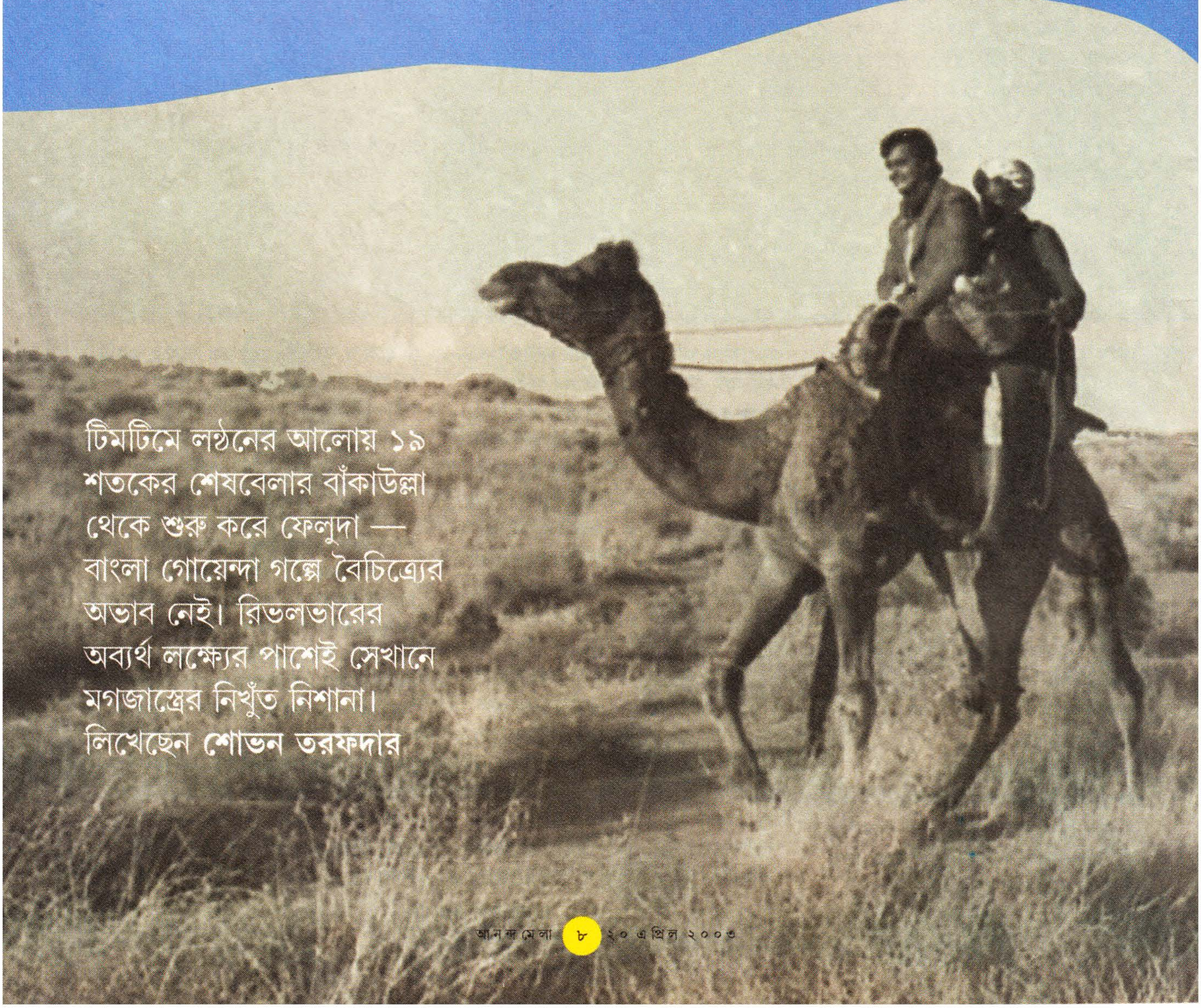
আরও উন্নত রোবোডগ তৈরির চেষ্টা চলছে। যেমন, রোবোসায়েন্স-এর রোবোডগ 'আর এস-০১' শব্দ করে ডাকে না, কিন্তু ৬০ টি শব্দ বুঝতে পারে। রোবোডগের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে রোবোকিটেন আর রোবোমাউজ অর্থাৎ যান্ত্রিক বিড়ালছানা আর নেংটি ইঁদুর। এগুলি মূলত খেলনা। ম্যানলে টয় কোয়েস্ট সংস্থা আবার রোবোপাখিও তৈরি করছে।

বিমল বসু



সাহিত্যে ডিটেকটিভ

প্র চ্ছ দ কা হি নী



টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় ১৯ শতকের শেষবেলার বাঁকাউল্লা থেকে শুরু করে ফেলুদা — বাংলা গোয়েন্দা গল্পে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। রিভলভারের অব্যর্থ লক্ষ্যের পাশেই সেখানে মগজাস্ত্রের নিখুঁত নিশানা। লিখেছেন **শোভন তরফদার**

"কোনও এক নগরে এক ঘাটের উপরে এক ব্রাহ্মণ একশত টাকার তোড়া বস্ত্রে বান্ধিয়া স্নান করিতে জলে নামিলে পর ডুব দিয়া উঠিয়া দেখে আপন বস্ত্রে টাকার তোড়া নাই..."

ব্যস, এই ছোট্ট চুরি থেকে শুরু হয়ে গেল যে গল্পের ধারা, তার আর শেষ নেই। বিরাম নেই। ১৮ শতকে পাদরি উইলিয়াম কেরি সাহেবের জোগাড় করা এই চুরির গল্পে এক বিচারক ছিলেন গোয়েন্দার ভূমিকায়। কিন্তু বড়ই সাদামাঠা সেই কাহিনী — ক্লাইম্যাক্স একটা আছে বটে, তবে তাতে গোয়েন্দার কৃতিত্ব যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশি অপরাধীর বোকামি। না হলে টাকার তোড়া নিয়েছিল যে গোয়ালা, খামোখা সে কেন ফাঁস করতে যাবে অপরাধের কথা!

বুদ্ধির প্যাঁচ একটা ছিল ঠিকই — বিচারক পেয়াদাকে বলে দিয়েছিলেন, ঘাটে যেখানে টাকার তোড়াটা ছিল, ঠিক সেখানে কোড়া (এক ধরনের হাতিয়ার, অনেকটা মুগুর টাইপের) মারবে। কোথাও কেউ নেই, পেয়াদা আর কোড়াবরদার গিয়ে ঘাটের উপর বেদম মারধোর শুরু করল! এবং তখনই সেই গোয়ালা ফস করে বলে বসল, "তোমরা এই স্থানে কোড়া মারিলে কি তোমাদের টাকা পাইবা?"

'আমি তো কলা খাইনি' গোছের এই অতিরিক্ত স্বীকারোক্তির কোনও প্রয়োজনই ছিল না, তবু টাকার কথা সে জানে তা কবুল করে জালে ফেঁসে গেল চোর, বমাল ধরা হল তাকে। খুব পুরনো এই গোয়েন্দা গল্পে আজ আর বিশেষ মজা পাওয়া যাবে না, কিন্তু একটু কাটাছেঁড়া করলে দেখা যাবে এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ক্রাইম ডিটেকশনের বীজ। আপাতভাবে বেখাপ্পা একটা কাজ করে অপরাধীকে টেনে আনা হচ্ছে অকুস্থলে, তার আগেই অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধী স্থানীয় কোনও লোক, কাছাকাছিই আছে, এবং তার পরে কৌশলে তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া হচ্ছে।

এই পর্যন্ত এসে বুঝতে পারি, সময় ঘনিয়ে আসছে। বাংলায় এইবার পুরোদস্তুর গোয়েন্দা গল্প লেখা শুরু হল বলে।

প্রিয়নাথ মুখুজ্জে, দারোগা এবং একটি খুন...

'বনমালী দাসের হত্যা'!

তৎকালীন সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মী ফেঁদে বসলেন এই হত্যাকাহিনীর কিস্‌সা। নাম হল 'দারোগার দপ্তর'। লেখক প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। দারোগার জীবনে দেখা নানা ঘটনার ঝুলি ঝেড়ে বের করে আনা হল নানান খুনজখমের কেস। ততদিনে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী সবে সাবালক হচ্ছে আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই একটি একটি



'সোনার কেল্লা' ছবির সেই বিখ্যাত সিকোয়েন্স: উটের পিঠে ফেলুদা, তোপসে ও জটায়ু
ফোটো: তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়



'সোনার কেল্লা' ছবির একটি দৃশ্য। লালমোহনবাবুর চরিত্রে সন্তোষ দত্ত (ডান দিকে)

করে বাড়ছে প্রিয়নাথের বই। প্রথমটি বেরিয়েছিল ১৮৯২-এর এপ্রিলে, থামল একেবারে ডবল সেঞ্চুরি পেরিয়ে। ২০৬টি!

মুখুজ্জের পরে চাটুজ্জে। কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তৎকালীন ঠগি-দমনকারী বিখ্যাত ইংরেজ প্রশাসক স্লিম্যানের দফতরের দাপুটে কর্মী দারোগা বরকতউল্লা ওরফে রকাউল্লা ওরফে বাঁকাউল্লার বিবিধ রোমহর্ষক কীর্তিকাহিনী নিয়ে জমজমাট 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'। বাঙালি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। তখনও বিজলিবাতি বড় একটা আসেনি, কালি-পড়া টিমটমে লণ্ঠনের আলো আর রহস্যময় গ্যাসবাতির জগৎ, গ্রামের দিকে ছমছমে রাতে হা রে রে রে করে ছুটে আসছে

হাইলি সাসপিশাস

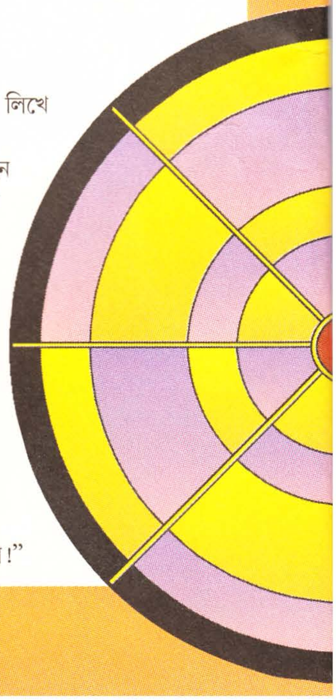
"বুঝে দেখ জটায়ুর কলমের জোর / ঘুরে গেছে রহস্য কাহিনীর মোড় / থোড় বড়ি খাড়া / লিখে তাড়া তাড়া / এইবারে লিখেছেন খাড়া বড়ি থোড়।"

লিখছেন ফেলুদা, অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়। এ ভারী মজা। নিজে অজস্র গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন সত্যজিৎ, আবার গোয়েন্দা গল্পের নামে যতরকম অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা লেখা হয়, তাকে ঠাট্টা করতেও ছাড়েননি। লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর চরিত্রের মধ্যেই থেকে গিয়েছে সেই ব্যঙ্গের বাণ। লালমোহনের 'হিরো' প্রখর রুদ্র যেসব কাজকম্মো চালিয়ে বিপুল জনপ্রিয়, আর বম্বের হিট ছবি-করিয়ে পুলক ঘোষাল তো বটেই, তোপসে পর্যন্ত তার ভক্ত পাঠক, তার অনেকটাই যে ভুয়ো, সেটা ফেলুদা ধরিয়ে না দিলে কী করেই বা জানা যেত!

এবং লালমোহনের জন্মের বহু আগে বাংলারই আর এক লেখক একটি গল্পে এমনই এক ঠাট্টার কথা লিখেছিলেন, "আমি অনেক সময়েই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম। ভাবভঙ্গিতে যাহাকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে, অনেক সময়েই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি।...অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি—তাহারা নিতান্ত ভালোমানুষ।"

গল্পের নাম 'ডিটেকটিভ'। লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনে পড়ছে, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দেখলেই লালমোহনের চাপা গলায় মন্তব্য, "হাইলি সাসপিশাস!"



ডাকাতদল! তারই মাঝে দেখা দিল এইসব দারোগা-বৃত্তান্ত। একদল পণ্ডিত বলেছিলেন, ব্রাম স্টোকার ড্রাকুলা লিখে যে এত নাম-ধাম করলেন, তার সবচেয়ে বড় কারণটা হল, আমাদের মনের মধ্যেই বাস করে ড্রাকুলা নামের সেই প্রেতাত্মা। তেমনই এখানেও বলা যায়, খুন-জখমের গল্প বাঙালি লুফে নিল। কারণ, ততদিনে তাদের মনের ভিতরেই গেঁথে গিয়েছে সেই ছক। একটা দিক খুনি তো আর একটা দিক গোয়েন্দা। এদের লুকোচুরি নিয়ে লেখা গল্পের মার নেই।

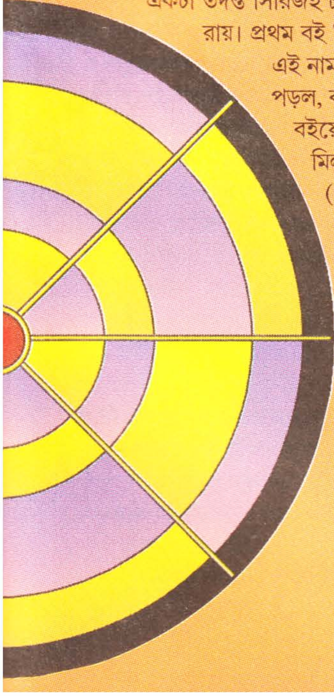
১৮৯৬-এ 'বাঁকাউল্লার দপ্তর'-এর আগেই ১৮৯৩-'৯৪-তে বেরিয়ে গিয়েছে 'সেকালের দারোগা কাহিনী'। আর বাংলা সন ১২৯৭-এ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখছেন 'হত্যাকারী কে'। ভারতী পত্রিকায় এই গল্প বেরোবার কিছুদিনের মধ্যেই 'সখা ও সাথী' কাগজে এই হরিসাধনই লিখবেন প্রথম কিশোর থ্রিলার 'আশ্চর্য হত্যাকাণ্ড'। এইভাবে একটা মোড় ঘুরছে। দারোগার কীর্তিকলাপ থেকে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে গল্পের জাল। নিছক কেস ডায়েরি গোত্রের বাস্তবভিত্তিক লেখা-টেখা নয়, অপরাধের জগতে ঢুকে পড়ছে কল্পনা।

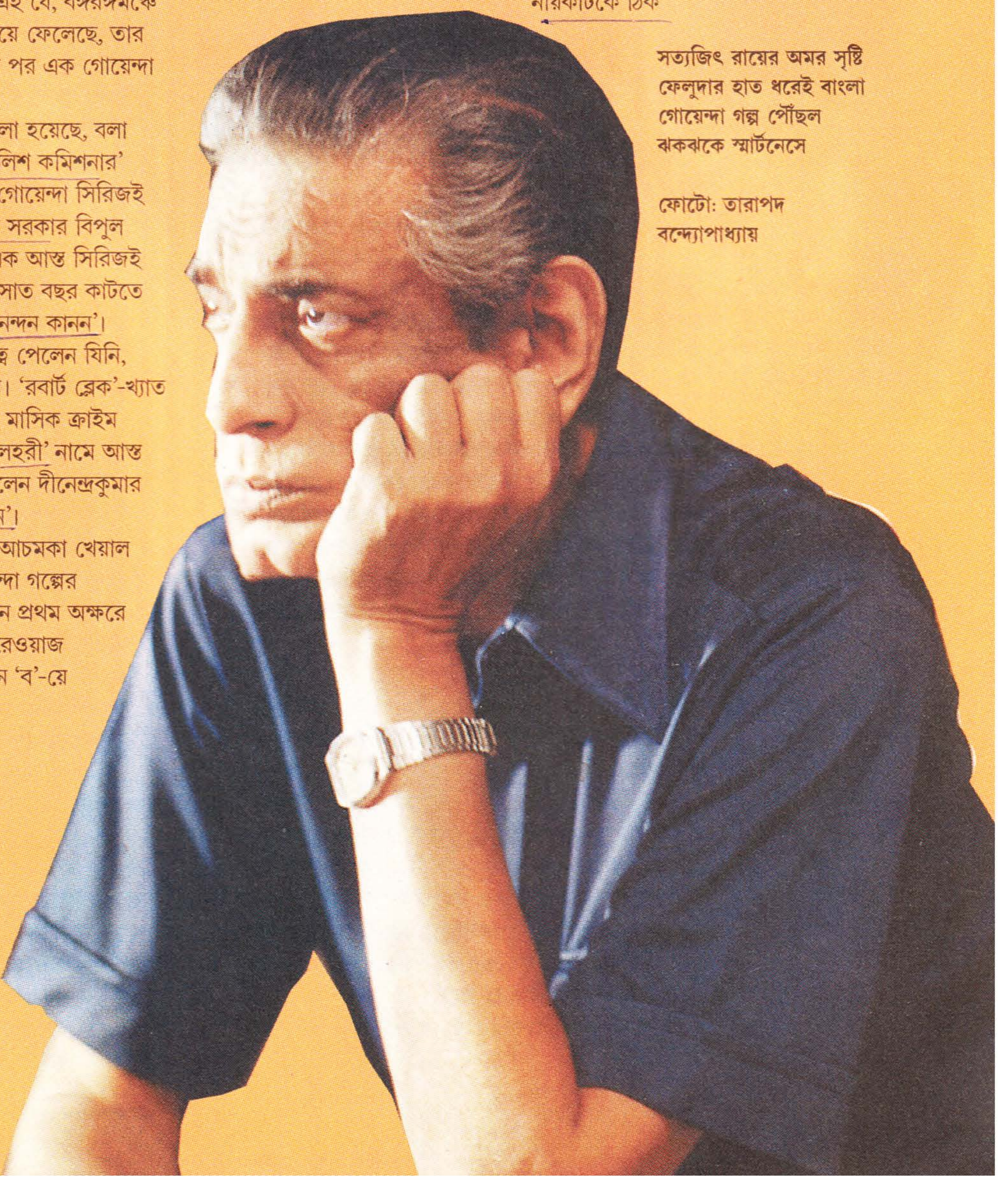
হবেই, হতে বাধ্য, না হলে কী করেই বা পাঁচকড়ি দে বিদেশি গল্পের ছায়ায় মেশাবেন বাঙালি স্থান-কাল-পাত্র, আর তৈরি হবে 'হত্যাকারী কে', 'নীলবসনা সুন্দরী'র মতো রোমহর্ষক সব কাহিনী। আর একটা মজা এই যে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে গোয়েন্দা গল্প যে কতটা পাকা আসন বানিয়ে ফেলেছে, তার একটা হাতে-গরম প্রমাণ রয়ে গেল একের পর এক গোয়েন্দা কাহিনী রচনায়।

প্রিয়নাথ মুখুজ্জের কথা তো আগেই বলা হয়েছে, বলা হয়নি ভুবনচন্দ্র মুখুজ্জের কথা। 'মার্কিন পুলিশ কমিশনার' নামে তাঁর ছ'খণ্ডের পেল্লায় গ্রন্থাবলী তো গোয়েন্দা সিরিজই বটে! আর নয়া বঙ্গশতকে পৌঁছে শরৎচন্দ্র সরকার বিপুল উৎসাহিত হয়ে 'গোয়েন্দা কাহিনী' নামে এক আস্ত সিরিজই বানিয়ে ফেললেন। সন ১৩০১। তার পর সাত বছর কাটতে না-কাটতেই বেরিয়ে গেল ক্রাইম পত্রিকা 'নন্দন কানন'। ১৩০৮ সনে সেই কাগজ সম্পাদনার দায়িত্ব পেলেন যিনি, তিনিও আর এক রহস্য সিরিজের কারিগর। 'রবার্ট ব্লেক'-খ্যাত দীনেন্দ্রকুমার রায়। গোড়ায় 'নন্দন কানন'ই মাসিক ক্রাইম সিরিজের আকার নিয়েছিল। পরে 'রহস্য লহরী' নামে আস্ত একটা তদন্ত সিরিজই চালু করে দিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। প্রথম বই 'বিধির বিধান'।

এই নামটা বলতেই আচমকা খেয়াল পড়ল, বাংলা গোয়েন্দা গল্পের বইয়ের নামে এমন প্রথম অক্ষরে মিল দেওয়ার রেওয়াজ (এখানে যেমন 'ব'-য়ে 'ব'-য়ে) কিন্তু সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে। 'দারোগার দপ্তর' তো মনে পড়বেই। আর এ-প্রসঙ্গে কী করেই বা ভুলে থাকা যায় লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে জটায়ুর গোয়েন্দা গল্পগুলির অসাধারণ নাম মাহাত্ম্য! 'সাহারায় শিহরণ', 'হন্ডুরাসে হাহাকার' গোছের নাম তো আমাদের মনের মধ্যে গাঁথা। আর জটায়ুর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ই বা কম কিসে? 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি', 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা', 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল', 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'রবার্টসনের রুবি' — উদাহরণের অভাব কী?

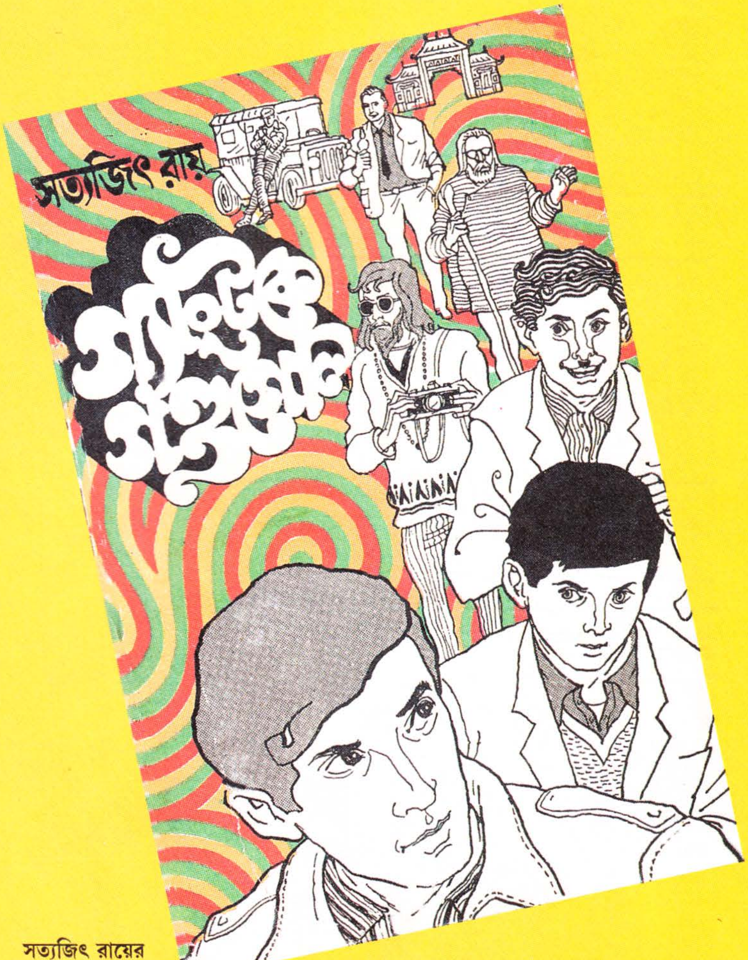
সত্যজিৎ রায়ের প্রসঙ্গে আবার পরে আসা যাবে। তার আগে পিছনের দিকটা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। গত শতকের গোড়ায় গোয়েন্দা সিরিজের ঢেউ ক্রমেই ভাসিয়ে দিল বাঙালির মন। বিশ শতকের তিনের দশকের শুরুতে 'রহস্যচক্র সিরিজ', ১৯৩৫-এ 'কাত্যায়নী গোয়েন্দা গ্রন্থমালা', ওই সময়েই রাধারমণ দাসের 'রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার' পত্রিকা, তিনের দশকের শেষে দেবসাহিত্য কুটীর থেকে 'প্রহেলিকা সিরিজ', প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কৃষ্ণা সিরিজ', শ্রীস্বপনকুমারের 'বিশ্বচক্র সিরিজ', ধর্মতলা থেকে প্রকাশিত 'বিচিত্র রহস্য সিরিজ' এবং অনিবার্য ভাবেই শশধর দত্তের 'মোহন সিরিজ'। এই শেষের দস্যু ওরফে রবিনহুড-মার্কা নায়কটিকে ঠিক





সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি ফেলুদার হাত ধরেই বাংলা গোয়েন্দা গল্প পৌঁছল ঝকঝকে স্মার্টনেসে

ফোটো: তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়



সত্যজিৎ রায়ের আঁকা ফেলুদা-কাহিনীর প্রচ্ছদ: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সৌজন্যে

গোয়েন্দা বলা যাবে কিনা সন্দেহ, তবে গোয়েন্দা-সুলভ রহস্য-রোমাঞ্চের কমতি নেই এর বিবিধ কার্যকলাপে।

সোনার ঘড়ি টিক টিক করে বয়ে চলেছে, আর বদলাচ্ছে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের চাল। আর হ্যাঁ, একটু একটু করে গোয়েন্দা গল্পও ঢুকে পড়ছে বাংলা সাহিত্যের হাইওয়েতে। ততদিনে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের মতো বাঘা বাঘা সাহিত্যিকেরা গোয়েন্দা গল্পের রসে মজে গিয়েছেন। হেমেন্দ্রকুমার রায় বা নীহাররঞ্জন গুপ্তও গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে ব্যস্ত — এমন সময় বাংলা ১৩৩৯ সনে, 'বসুমতী'র পাতায়, দেখা দিলেন এক যুবক। নিপাট বাঙালি। মেধাতেও নিপুণ।

নিজের খেতাব দিয়েছি সত্যান্বেষী এবং অন্যান্য...

কারণটা তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক।

"ডিটেকটিভ কথা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ।" তাই শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বক্সী সত্যের অন্বেষণ করে বেড়ান। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই বঙ্গসন্তানের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন গল্পের কথক অজিতের জবানিতে। কেমন সেই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্ত?

"তাহার বয়স বোধকরি বছর তেইশ-চব্বিশ হইবে; দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা—মুখেচোখে একটা বুদ্ধির ছাপ আছে।" তা হলে আর পাঁচটা বাঙালি যুবকের থেকে তাঁর ফারাক কোথায়? ফারাকটা নেই বলেই তো সুবিধে। না হলে অজিতের মেসে ঠাঁই নেওয়ার পরে যে কেউই তো বুঝে ফেলত, এই ছেলে যে-সে ছেলে নয়। তবে মেসে ঢুকে

শার্লক হোম্স এবং তাঁর বাঙালি বন্ধুরা

কোথায় সেই সাগরপারের বিলেত মুলুকে কোনান ডয়েলের কাজকারবার, আর কোথায় এই বাংলা! তবু বাঙালি বহুকালই ফেল্ট হ্যাট, পাইপ-শোভিত এই গোয়েন্দা-শিরোমণির মুগ্ধ পাঠক। ভালবাসা এতটাই যে, শার্লক হোম্স বঙ্গানুবাদে নেমে এলেন নয়া অবতারে, নাম হল 'সরলাক্ষ হোম'। ভোলবদলটি করলেন যিনি, সেই রাজশেখর বসুই তো শার্লক হোম্সকে অন্য আর একভাবে টেনে আনলেন বাংলার দরবারে। আশ্চর্য, অমন দুঁদে গোয়েন্দাকেও কিনা নিতান্ত বাঙালি রাখাল মুস্তৌফির শরণাপন্ন হতে হল!

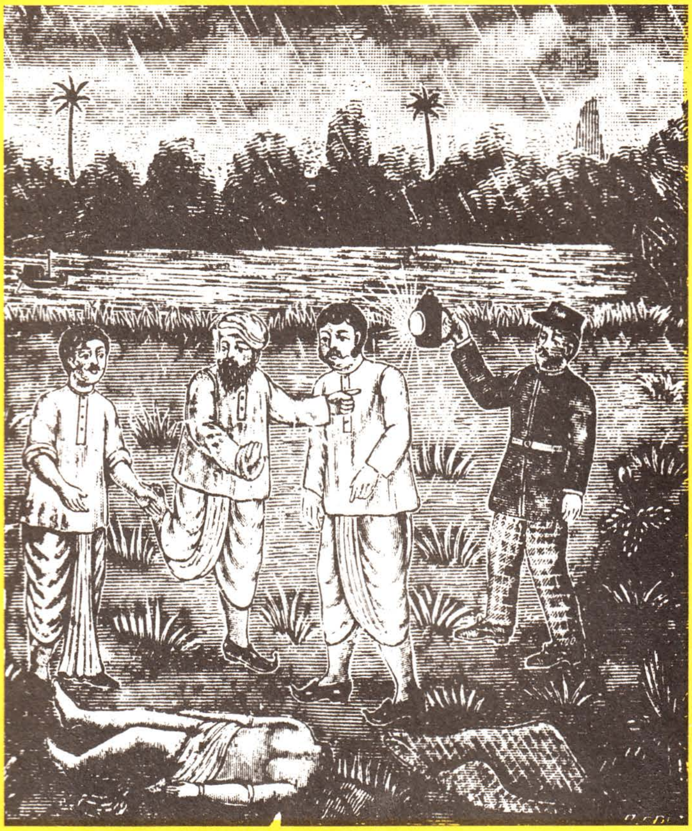
এতেই অবশ্য বাঙালির হোম্স-অনুরাগ ফুরোচ্ছে না। অজস্র অনুবাদ যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, বঙ্গসন্তানেরাই এই কলকাতায় গড়ে তুলেছেন আস্ত একটি সঙ্ঘ, 'হোমসিয়ানা'। শুধুই হোম্স-চর্চা এই সঙ্ঘের কর্মসূচির মধ্যে পড়েনি বটে, তবে 'হোমসিয়ানা'র তরফে সুভদ্রকুমার সেন জানালেন, আদতে বাঙালিদের মধ্যে গোয়েন্দা গল্পের চর্চা আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যেই যখন সঙ্ঘের পরিকল্পনা করা হল, তখন খোঁজ পড়ল এমন এক গোয়েন্দার, যিনি কিনা স্বয়ং গোয়েন্দাগিরির প্রতীক। আর গড় বাঙালি যাঁর গল্প না পড়লেও অন্তত নামটা শুনেছে নিশ্চিত। শার্লক হোম্স।



সুতরাং, 'হোমসিয়ানা'। সূত্রপাত ১৯৮৩-র ২৭ অগস্ট। দিনটি নষ্টচন্দ্রের তিথি—'শুভ' লগ্ন, কেননা সেই দিনেই নাকি চুরিবৃত্তিতে নেমেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। সুকুমার সেন, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাদল বসু প্রমুখর প্রত্যক্ষ যোগদানে চলত নিয়মিত গোয়েন্দা গল্প পাঠের আসর। বাংলা ভাষায় প্রথম বারোয়ারি গোয়েন্দা উপন্যাস 'পাঞ্চজন্য'ও 'হোমসিয়ানা'র ফসল। লেখক তালিকায় ছিলেন সুকুমার সেন, সমরেশ বসু, আনন্দ বাগচী, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় এবং সুভদ্রকুমার সেন।



প্রেমেন্দ্র মিত্র। গোয়েন্দা পরাশর বর্মার স্রষ্টা ইনি



১৯ শতকের বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ইলাসট্রেশন

মাদকের কারবারি ডাক্তারকে হাতেনাতে ধরে ফেলার পরে ব্যোমকেশ জানাচ্ছেন তাঁর একেবারে পরিকল্পনা-মাফিক মেসে প্রবেশের কার্যকারণ:

"কোনও অনুসন্ধান চালাতে গেলে অকুস্থানের কাছেই base of operations থাকা দরকার, তাই তোমাদের মেসটা বেছে নিয়েছিলুম। তখন কে জানত যে, বিপক্ষ দলেরও base of operation ওই একই জায়গায়!"

কিরীটি রায়ের মতো টুপি-ওভারকোট মোড়া বিলিতি ছাঁদের গোয়েন্দা নয়, দস্যু মোহনের মতো জলে-স্থলে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় না, তারপর 'কোথা হইতে কী ঘটিয়া গেল' গোছের আজগুবি কীর্তিকলাপেও নেই— এই যুবা ঠাণ্ডা মাথায়, ধীরে রহস্যের জট ছাড়াতে ভালবাসেন। প্রথমে থাকার ভাল জায়গা ছিল না, পরে বাড়ি করলেন। কলকাতার দক্ষিণে। বিয়ে হল। স্ত্রীর নাম সত্যবতী। বিয়ের পরও কিন্তু রহস্যভেদে ভাটা পড়েনি। বাঙালি আপন করে নিল এই গোয়েন্দাকে। আপাতভাবে কিছুই অসাধারণ নয়, অথচ ঝকঝকে বুদ্ধির আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসে রহস্যের তদন্তে। 'সীমন্ত হীরা', 'পথের কাঁটা', 'আদিম রিপু', 'চিড়িয়াখানা', এমন আরও অনেক গল্পে ছড়িয়ে রইল আপাত সরল, সিধেসাধা ব্যোমকেশ বক্সীর প্রতিভার স্বাক্ষর।

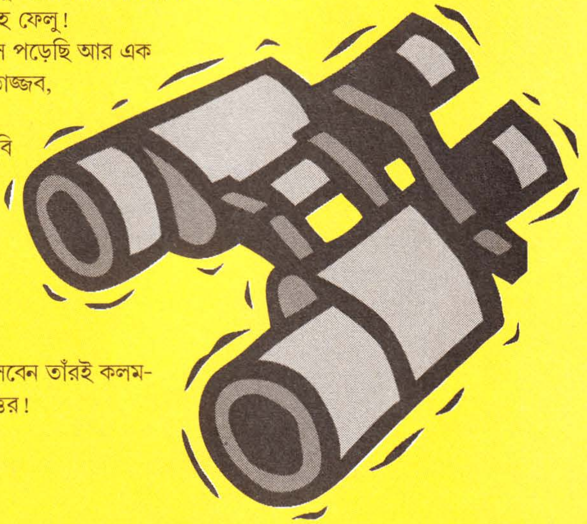
যেমন, 'চিড়িয়াখানা' উপন্যাসে ভুজঙ্গধরবাবু যখন খুনের কুকীর্তি চাপা দেওয়ার জন্য মোক্ষম একখানা 'অ্যালিবাই', অর্থাৎ ডিকশনারির ভাষায় বললে, 'অপরাধ সংঘটনকালে অন্যত্র থাকিবার অজুহাত' চাপিয়ে দিলেন, তখন ব্যোমকেশের মেধা ঝলসে উঠল একেবারে শাণিত খড়্গের মতো।

"আপনি যে অ্যালিবাই তৈরি করেছিলেন তা সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু ধোপে টিকল না। সে রাত্রে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে আপনি মিনিট পাঁচেক সেতার বাজিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বাকি সময়টা বাজিয়েছিলেন আপনার স্ত্রী।"

সেতারি ভুজঙ্গধর ভেবেছিলেন, সেতারের আওয়াজ মানেই সকলে ভাববে, ওই তো ভুজঙ্গধরই বাজাচ্ছেন। সুতরাং, সেতারের আওয়াজই সবচেয়ে বড় আড়াল। ভাবেননি, ব্যোমকেশ বক্সীর মতো এক সত্যান্বেষী কীভাবে শব্দভেদী দৃষ্টি ছুড়ে ঠিক দেখে ফেলবেন খুনের কাণ্ড। কিংবা 'পথের কাঁটা' গল্পের শুরুই হয় একটা আপাত অর্থহীন বিজ্ঞাপন থেকে!

সাধে কি আর সিধু জ্যাঠা বলেছিলেন, চোখকানগুলোকে একটু খোলা রেখো হে ফেলু!

কথায় কথায় এসে পড়েছি আর এক গোয়েন্দার প্রসঙ্গে। তাজ্জব, শরদিন্দুর এই 'চিড়িয়াখানা' নিয়ে ছবি করার সময়ও কি সত্যজিৎ রায় ভাবতে পেরেছিলেন, আর কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যোমকেশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে উঠে আসবেন তাঁরই কলম-প্রসূত এক ফেলু মিত্তির!





মেয়েরাই বা কম কিসে

কে বলেছে গোয়েন্দাগিরি শুধুই 'ছেলে'দের কাজ?

মানছি, চেনা গোয়েন্দাদের প্রায় সকলেই পুরুষ। মানছি, আগাথা ক্রিস্টির মিস মার্প্‌ল গোয়েন্দাগিরিতে যে জায়গাটায় গিয়েছেন, আজ পর্যন্ত কোনও বঙ্গনারী সেই জায়গাটায় যেতে পারেননি। মেয়ে-গোয়েন্দাদের মধ্যে মিস মার্প্‌লই যে একমাত্র, তা-ও নয়। আছেন পি ডি জেম্‌স-এর কর্নেলিয়াও। কর্নেলিয়ার আবির্ভাব যে উপন্যাসে, তার নামটাও বেশ প্রতীকী। 'অ্যান আনসুটেবল টাস্ক ফর আ উম্যান'। কিন্তু এ-কথা মোটেই মানছি না যে, আমাদের কিছুই নেই।

গোয়েন্দা-কাহিনীর 'লেখিকা'ও আছেন, এবং মেয়ে-গোয়েন্দা তো আছেই। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'কৃষ্ণা সিরিজ'-এর কথা তুলবেন অনেকেই, কিন্তু সে তো অনেক পরের ঘটনা। প্রথম পথ কাটলেন কে?

সরলাবালা সরকার। সেই যে কুন্তলীন পুরস্কার-খ্যাত হেমেন্দ্রমোহন বসু, যিনি আবার 'এইচ বোস' নামেই বিখ্যাত, কুন্তলীনের তালিকায় গোয়েন্দা গল্পকেও সরিয়ে রাখেননি। তাতেই গোয়েন্দা গল্প লিখে দু'বার পুরস্কার পেয়েছিলেন সরলাবালা। আর বাংলা গোয়েন্দা গল্পের সেই আদিপর্বে যাঁর সহযোগিতা ছিল প্রবল, তিনিও মহিলা। 'ভারতী' পত্রিকার স্বর্ণকুমারী দেবী।

এবং নারী গোয়েন্দাও কি কম? কৃষ্ণার পরে আস্তে আস্তে অনেকেই। প্রদীপ্ত রায়ের জগাপিসি, মনোজ সেনের দময়ন্তী, প্রতুল গুপ্তের সদুঠাকুমা, রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের গীতা এবং অঞ্জলি, হালফিল তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গার্গী, মঞ্জিল সেনের গোয়েন্দা গণ্ডালু, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন— তালিকা খুব একটা ছোট নয়। এবং মিস মার্প্‌লের গল্প অনুসরণে ঋতুপর্ণ ঘোষের সাম্প্রতিক ছবি 'শুভ মহরৎ'।

এইখানে ছোট্ট একটুকরো তথ্য। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে নাকি গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথম উল্লেখ মেলে, জানিয়েছেন পণ্ডিতেরা। 'পণি' নামে একটি ডাকাত দল দেবতাদের গোরু চুরি করেছিল। তাদেরই ধরে আনতে ডাক পড়ে সেই গোয়েন্দার। সরমা। একটি কুকুরী। বিশ্বের প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনীর হিরো (নাকি হিরোইন)!



ব্যোমকেশ বক্সীর স্রষ্টা
শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন...

'ত্রিনয়ন' কথাটা যে আসলে তিন চোখ বোঝাচ্ছে না জানি, ঘুরঘুটিয়ার ঘটনাটা মনে পড়লেই বুঝতে পারা যাবে সে কথা— কিন্তু ত্রিনয়ন মানে যদি দু'চোখের বাইরে আরও একটা চোখ হয়, তা হলে নিশ্চিত শার্লক হোম্‌সের মতো ফেলুদারও সেই তৃতীয় নেত্রটি ছিল।

তবে রজনী সেন রোডের ভেতো বাঙালি, দুপুরে খাওয়ার পরে পান মুখে দেওয়ার অভ্যেস, নেশা বলতে সিগারেট, ব্র্যান্ড চারমিনার, এখনও পর্যন্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন না বলেই খবর, তবে স্বাস্থ্যটা ভাল, উচ্চতা ছ'ফুট, রোজ ব্যায়াম করেন, বন্দুক-পিস্তলে নিশানা অব্যর্থ এবং নিয়মিত যাতে ধার দেন, সেই বস্তুটির নাম মগজাস্ত্র।

তবে নিজেকে গোয়েন্দা বলে সাফ জানিয়ে দেওয়াতে কোনও আপত্তি নেই। ভিজিটিং কার্ডে স্পষ্ট লেখা Pradosh C. Mitter, Private Investigator. আর ওই রকম যাঁর দৃষ্টিশক্তি, তিনি ফলাও করে জাহির না করলেও গোয়েন্দাগিরির ক্ষমতা বেরিয়ে আসতে বাধ্য। তোপসে তো একেবারে হাঁ। কখন?

যখন ফেলুদা বললেন, "আমি আজ ম্যালে যাইনি, তবু বলে দিতে পারি তুই কোন দিকের বেঞ্চে বসেছিলি।"

— কোন দিক?

— রাধা রেস্টোর‍্যান্টের ডান পাশের বেঞ্চগুলোর একটাতে?

—আরেব্বাস! কী করে বুঝলে?

—আজ বিকেলে রোদ ছিল। তোর বাঁ গালটা ঝলসেছে, ডান ধারেরটা ঝলসায়নি। একমাত্র ওই বেঞ্চিগুলোর একটাতে বসলেই পশ্চিমের রোদটা বাঁ গালে পড়ে।"



মিস মার্প্‌লের বাঙালি সংস্করণ: ঋতুপর্ণ ঘোষের 'শুভ মহরৎ' ছবিতে রাখী (বাঁ দিকে) ফোটো: অশোক মজুমদার

ডিডাকশন! মনে পড়ে যাবেই ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের সেই পাইপধারীর কথা। অতিথি ঘরে ঢুকতেই দ্রুত বলে দিলেন তাঁর নানা হালহদিস। এবং কী করে করলেন, পরে সঙ্গীকে সে কথা ব্যাখ্যা করে বলার সময় সেই প্রবাদবাক্য— "এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন।"

তা আমাদের ফেলুদাই বা কম কিসে? 'দরওয়াজা বন্ধ করো'—এই হুকুম যে সাহেবি জিভে হয়ে যায় 'দারওয়াজা ব্রান ক্রো', ফলে শুনতে লাগে অনেকটা 'দেয়ার ওয়াজ আ ব্রাউন ক্রো'-র মতো, সেটা ফেলুদা ধরিয়ে না দিলে কোনওদিন জানতে পারতাম? আর ইংরেজি-বাংলার এই জট ছাড়িয়ে যখন বাংলা 'ত্রিনয়ন' থেকে সঙ্কেতের আদত ইংরেজি বুলি থ্রি-নাইনে পৌঁছে যাচ্ছেন এই বাঙালি যুবা, তখন একটা কথাই বলা যায়, ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়! চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ফেলুদার বেশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে বলছেন, "খটকা লাগছে রে তোপসে..." (হ্যাঁ, সৌমিত্রই এখনও, সব্যসাচী চক্রবর্তীও দারুণ, তবু...)। ক্যামেরা আস্তে আস্তে জুম করছে তাঁর মুখের উপরে, বিগ ক্লোজে ধরা পড়ছে আলো-ছায়া...

হ্যাঁ, ফেলুদা বললেই বারবার মনে পড়ে যায় সিনেমার কথা। জয়ন্ত-মানিককে মনে আছে, মনে আছে আমাদের চিরকালের চেনা পুলিশ অফিসারের আর্কেটাইপ খাদ্যরসিক সুন্দরবাবুকেও, তবু ফেলুদা যেন ঠিক ওই পাশের বাড়িটায় থাকা দাদা, চিনি অনেক কাল, তাঁকেই আবার সিনেমার পরদায় দেখে অবাকও হই! লালমোহনবাবুর মুখটা মনে পড়ছে, সেই সোনার কেল্লায় রাতে স্টেশনে ফেলুদা যখন রিভলভারটা দেখিয়ে বললেন, "আপনার প্রখর রুদ্র কি এটাই চালায়, ঠাঁই- ঠাঁই- ঠাঁই- ঠাঁই- ঠাঁই!"

নটে গাছটি মুড়োল

আসলে প্রিয়নাথ মুখুজ্জে থেকে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর ধারাটাই তো আশ্চর্য একটা প্যানোরামা! ব্যোমকেশ বা ফেলুদা তাতে নক্ষত্র, কিন্তু কী করেই বা ভুলব আরও অনেকের কথা? সমরেশ বসুর 'অশোক ঠাকুর' এবং খুদে গোয়েন্দা 'গোগোল', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু' রাজা রায়চৌধুরী (অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, তবে গোয়েন্দা তো বটেই), অদ্রীশ বর্ধনের 'ইন্দ্রনাথ রুদ্র', সমরেশ মজুমদারের 'অমল সোম' এবং 'অর্জুন', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'চারু ভাদুড়ি', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা বরদাচরণ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডব গোয়েন্দা —কিংবা একটু পিছিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরাশর বর্মা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হুকাকাশি', শিবরাম চক্রবর্তীর 'কল্কে কাশি'। পরিমল গোস্বামী থেকে মঞ্জিল সেন, কত অজস্র লেখকই যে বাংলা ভাষায় রহস্যের প্যাঁচ কষেছেন!

তবে শেষ করার আগে চুপিচুপি একটা সত্যি কথা বলি। এখনও কিন্তু পুজোর সময়টা এলে ফেলুদার জন্য মনটা খারাপ হয়ে যায়। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের বিশাল চালচিত্রটার ধুলো ঝেড়ে সেটার দিকে নতুন করে তাকাতে গিয়ে মনের মধ্যে সেই ব্যথাটা ফের ঢেউ দিল। কবুল করি, তোপসে তো আর একটা নয়, মনে মনে আমরা সকলেই তো তোপসে!

ফেলুদার পুরনো সব বই গোগ্রাসে গিলি, কবে যে রিলিজ করবে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'-টা সেই কথাটা ভাবতে ভাবতে দিন গুনি, 'আনন্দমেলা'য় ফেলুদার ছবি-দেওয়া কমিক্‌স পড়ে ঘোলেই মেটাই দুধের স্বাদ, আর আমাদের সবার মনের কথাটা হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় কবীর সুমনের লেখা ফেলুদার গানে— "গল্পে আমি দিব্যি ছিলাম / গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীত/ আমার গল্প সঙ্গে নিয়ে / চলে গেলেন সত্যজিৎ..."


আগাথা ক্রিস্টি

সুইজারল্যান্ডই, তবে ভয়ঙ্কর। গিরিশিরার গা ঘেঁষে গভীর খাদ। ভয়াবহ রিকেনবাক ফল্‌স। অথচ ছ'ফুটের উপর লম্বা সেই রোগা, একহারা চেহারার ভদ্রলোক নীচে নয়, সামনের দিকে তাকিয়ে। মাথায় সেই চিরপরিচিত ডিয়ারকস্টার হ্যাট, ধারালো চোয়াল এখন শক্ত, তীক্ষ্ম নাক। দৃষ্টি সামনে, সেখানে মৃত্যুর মতো দাঁড়িয়ে প্রফেসর মরিয়ার্টি। অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ, সমস্ত নীতিহীন কাজের কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক।

আচমকাই শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। মরিয়ার্টির সঙ্গে হাতাহাতি করতে করতে ভদ্রলোক পৌঁছে গেলেন খাদের কিনারায়। কোটি কোটি ভক্ত পড়তে পড়তে শিউরে উঠলেন, শার্লক হোম্‌স প্রফেসর মরিয়ার্টিকে নিয়ে পড়ে গেছেন গভীর খাদে। কেটে গেল ঘাসপাতা না-নড়া কয়েকটা মিনিট। ফিরল না কোনও প্রতিধ্বনি, ফিরলেন না ডিয়ারকস্টার হ্যাট আর প্রশ্নচিহ্নের মতো বাঁকানো পাইপের মালিক হোম্‌স। পাঠকরা স্তম্ভিত, একযোগে তাঁরা প্রতিবাদ জানালেন লেখক আর্থার কোনান ডয়েলের কাছে। পাঠকদের ধমক আর্থার কোনান ডয়েলকে আবার একবার ভাবতে বাধ্য করল, সত্যিই কি এত তাড়াতাড়ি মারা যেতে পারেন শার্লক হোম্‌স? এত অসংখ্য পাঠকের মুগ্ধতাকে অগ্রাহ্য করে? অতএব খাদে পড়ে যাওয়ার তিন বছর পর, ১৮৯৪ সালে সকলকে চমকে দিয়ে ফিরে এলেন শার্লক হোম্‌স। জানা গেল, খাদের একেবারে নীচে পড়ে যাননি তিনি! পড়ার সময় আটকে গিয়ে কোনওমতে বেঁচে গেছেন।

এই সেই শার্লক হোম্‌স, যিনি ছাই দেখে বলে দিতে পারেন, সেটা কোন তামাকের। হাতের আকার দেখে বুঝে

বিদেশি গোয়েন্দাদের সঙ্গে

হোম্‌স তো স্বনামধন্য, পোয়ারো মারাত্মক জনপ্রিয়, টিনটিন আমাদের চোখের মণি। এঁরা ছাড়াও আছেন আরও বিদেশি গোয়েন্দা। তাঁদেরই কয়েকজনকে নিয়ে লিখেছেন **চন্দন সাউ**

নিতে পারেন মানুষের পেশা। ইনস্পেক্টর গ্রেগরিকে ধরিয়ে দেন, "রাতে কুকুরটা অদ্ভুত আচরণ করেছে।" অবাক গ্রেগরি বলেন, "কই, কুকুরটা তো আদৌ কিছু করেনি!"

"সেটাই তো আশ্চর্যের..."

২২১ বি, বেকার স্ট্রিট। এই ঠিকানায় মিসেস হাডসনের বাড়িতে ভাড়া থাকেন চিরকুমার হোম্‌স এবং তাঁর সহকারী ডাক্তার ওয়াটসন। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এই গোয়েন্দা অবসরে বেহালা বাজান। মজার ব্যাপার, আজও লন্ডন শহরে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যত পর্যটক বেড়াতে যান, তাঁদের একটা বড় অংশই শার্লক হোম্‌সের বাড়ি খুঁজতে যান। ২২১ বি, বেকার স্ট্রিটে এখন তৈরি হয়েছে শার্লক হোম্‌স মিউজিয়াম।

খুব বেশি দূরে নয় ১৪ নম্বর ফার অ্যাওয়ে স্ট্রিট। আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো একসময় থাকতেন এখানে, অবশ্য পোয়ারো অনেক জায়গাতেই থেকেছেন, শুধু লন্ডন শহরে নয়, ইংল্যান্ডের কান্ট্রিসাইডেও তাঁর বাড়ি ছিল। বহু রহস্য সমাধান করা মাথাটা প্রায়ই হেলে থাকে বাঁ দিকে। তিনি নিজেই বলেন, রহস্যের সমাধানে তাঁর একমাত্র অস্ত্র, "লিটল গ্রে সেলস"। মানে, মগজের ধূসর কোষ। তিনি হোম্‌সের মতো পায়ের ছাপ বা সিগারেটের টুকরো নিয়ে আদৌ উৎসাহী নন। তাঁর পছন্দ অন্তহীন কথাবার্তা এবং চোখ বুজে ভাবা। চারপাশের লোকজনের কথার মধ্যে থেকেই তিনি দু'য়ে দু'য়ে পাঁচ করে ফেলেন। কিন্তু পোয়ারো হোম্‌সের মতো লম্বা নন, বেশ বেঁটে। উচ্চতা বড়জোর সাড়ে পাঁচ ফুট। ইনি মনে করেন, তাঁর কেসগুলো সমাধান করা অন্য কোনও গোয়েন্দার কম্ম নয়। পোয়ারোর খুব গর্বের জিনিস তাঁর গোঁফটা। নিয়ম করে মোম মাখিয়ে গোঁফের সেবা করেন এরকুল পোয়ারো। জামাকাপড়ের ব্যাপারেও তিনি খুব শৌখিন, সঙ্গে অধিকাংশ সময় থাকে মানানসই ছড়ি। ছড়ি রাখার কারণ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাওয়া আঘাত। ছড়ি ছাড়া হাঁটতে বেশ অসুবিধে হয় তাঁর। হোম্‌সের মতো পোয়ারোর সঙ্গী ক্যাপ্টেন হেস্টিংসও বিবাহিত, তিনি থাকেন আর্জেন্টিনায়। পোয়ারো জন্মসূত্রে বেলজিয়ান, ইংল্যান্ডে তাঁর প্রবেশ রিফিউজি হিসেবে। পোয়ারোর অদ্ভুত কাঠ-কাঠ ইংরেজি শুনে বুঝে নেওয়াটা স্বাভাবিক যে, তাঁর মাতৃভাষা ফরাসি।

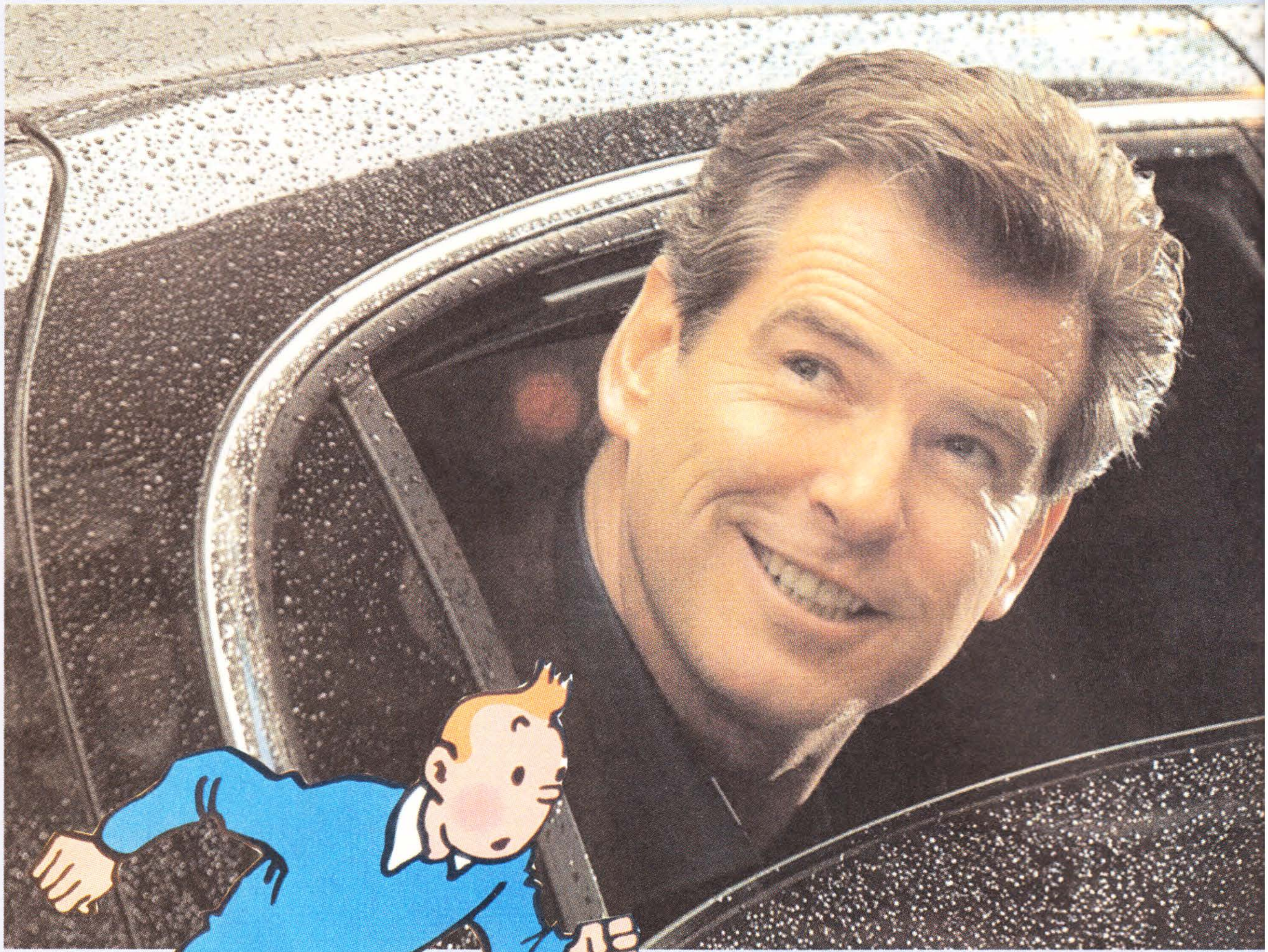
ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের শান্তির জীবন থেকে চলে আসা যায় জেটসেট আধুনিক জীবনচর্যায়। জেমস বন্ডকে কে না চেনে? দুর্দান্ত বক্সার। ছুরি, পিস্তল, রাইফেল, উড়ন্ত গাড়ি, সাবমেরিন, জুয়ার আড্ডা, হেলিকপ্টার — সবেতেই বন্ড সিদ্ধহস্ত। ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র তিনি। উচ্চতা ১৮৩ সেমি, ওজন ৭৬ কেজি, চোখের তারা নীল, চুল কালো। স্বাভাবিকভাবেই মহিলারা বন্ডকে নিয়ে পাগল। বন্ডের সৃষ্টিকর্তা ইয়ান ফ্লেমিং নাকি একটা ভোঁতা চরিত্রের গোয়েন্দা গড়তে চেয়েছিলেন। অবশ্য বন্ডকে ঠিক গোয়েন্দা বলা যায় না। তিনি আসলে গুপ্তচর। ইংরেজি ছাড়াও ঝরঝরে ফরাসি আর জার্মান বলতে পারেন তিনি।

সাইমন টেম্পলার, ওরফে সেন্ট। আইনকানুনের খুব একটা পরোয়া করে না এই দুঃসাহসী। সে অনুসন্ধান করে অপরাধীকে খুঁজে বার করে এবং প্রাপ্য শাস্তি দেয়। খানিকটা রবিনহুডের মতো ভাবমূর্তি। চোরের উপর সে বাটপাড়ি করে, ডাকাতকে শিক্ষা দেয় ডাকাতি করে। অপরাধীদের উত্তম-মধ্যম দেওয়ার পর সে অকুস্থলে ফেলে যায় নিজের 'কলিং কার্ড' — কাঠি কাঠি হাত-পায়ের একটা মানুষের ছবি আঁকা থাকে তাতে। এই দেখেই অপরাধী বুঝে যায় সেন্ট এসেছিল। নিউ ইয়র্ক আর লন্ডন — দু'-দুটো বড় শহরের পুলিশের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে সেন্টের নানা কীর্তিকলাপ। তবে, সেন্ট ততটা জনপ্রিয় হতে পারেনি।

ডেনভারের ১৫তম ডিউকের বংশধর পিটার উইমজি। ক্রিকেটভক্ত, অভিজাত অথচ একেবারেই নিরহঙ্কার এই ভদ্রলোক বাগদত্তাকে রেখে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। মহিলা কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করেননি, বিয়ে করে নিলেন আর একজন পছন্দের মানুষকে। যুদ্ধ শেষ হলে সার্ভিস অর্ডারের মতো সম্মান নিয়ে উইমজি



'হাউন্ডস অব বাস্কারভিলস'-এর প্রথম প্রকাশের ১০০ বছর পূর্তিতে শার্লক হোমসের সাজে এক ভক্ত



পিয়ার্স ব্রসনান — রুপোলি পরদায় ইনি জেমস বন্ড



টিনটিন

ফিরে এলেন লন্ডনে, ডেরা বাঁধলেন পিকাডিলিতে। সঙ্গী হলেন অধস্তন সার্জেন্ট বান্টার। যুদ্ধের স্মৃতি তাঁকে অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছিল। তা থেকে মুক্তি পেতে তিনি বেছে নিলেন বই, পিয়ানো আর অপরাধ তদন্তকে। ক্রমশ হয়ে উঠলেন বিখ্যাত এক অপেশাদার গোয়েন্দা।

লন্ডন শহরে বাইরে শান্ত, কান্ট্রিসাইডের ছোট্ট গ্রাম সেন্ট মেরি মিড। এখানেই থাকেন ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী গোয়েন্দা মিস মার্পল। ইনি কিন্তু বয়স্কা মহিলা। চেয়ারে বসে উল বুনতে বুনতে ইনি সমাধান করে ফেলেন অনেক কঠিন রহস্যের। বাগান করা, চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে পাখি দেখা এঁর প্যাশন। অবশ্য আসলে ইনি পাখি দেখেন না, দেখেন মানুষের কীর্তিকলাপ। ছোট্ট গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে প্যারালাল টেনে ইনি অচেনা মানবচরিত্রের নানা সুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলেন।

ইংল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্বে এসেক্স কাউন্টিতে থাকেন জি. কে. চেস্টারটনের সৃষ্টি গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউন। দেখলে মনে হয় বেশ শান্তশিষ্ট, খুনের সমাধান ইনি করেন কেমন করে? এঁর নিজের ভাষায়, “মনের কেমন অবস্থা থাকলে মানুষ এমনটা করে? সেই অবস্থাটা তৈরি করি নিজের মনে। তখন মনে হয় আমিই যেন খুনি। বাস্তবে আসল খুনির পরিচয়টা তখনই টের পেয়ে যাই।”

ইংল্যান্ড ছেড়ে এবার ফ্রান্স। ফরাসিরা সুগন্ধের ভক্ত। গোয়েন্দা অগুস্ত দ্যুঁপোও গড়পড়তা ফরাসির চেয়ে আলাদা নন। তাঁর ঘর অন্ধকার, শুধু ধূপকাঠির মাথার লাল বিন্দুগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। প্যারিসের ৩৩ নম্বর ডু রুন্টের বাড়ির লাইব্রেরি এটা। ঘন অন্ধকারে পছন্দের চেয়ারে বসে সমস্যার জটগুলো খুলে ফেলেন তিনি।

এই মহারথীদের মাঝখানে টিনটিনকে বলা যায় ‘খোকা ডিটেকটিভ’। পেশায় তিনি সাংবাদিক, সব সময়ের সঙ্গী কুকুর স্নোয়ি। যে কোনও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে জুড়ি নেই টিনটিনের। দক্ষিণ আমেরিকার ঘন জঙ্গলের মধ্যে ইনকা রাজাদের প্রাসাদই হোক, কিংবা হিমালয়ের ধু-ধু বরফে ইয়েতির বাসা — সর্বত্রই অবাধ গতি টিনটিনের। আর টিনটিনের ভক্তরা কি ভুলতে পারে মানিকজোড় জনসন আর রনসনকে (ইংরেজিতে থমসন অ্যান্ড থমসন, ফরাসিতে দ্যুপঁ ও দ্যুপঁ)? মাথায় বুদ্ধি একটু কম বটে, তবে টিনটিনের অধিকাংশ বিপদের সময়েই পাশে থেকেছেন এই জোড়া গোয়েন্দা।

ফোটো: এ এফ পি

গোয়েন্দারা আছেন ইন্টারনেটেও

ইন্টারনেট

গোয়েন্দাগিরির রোমহর্ষক ইতিহাস জানার জন্য আছে দারুণ সব সাইট। লিখেছেন
সৌরভ চক্রবর্তী

“এখনও ব্যোমকেশ পড়তে কীরকম ভাল লাগে, তাই না বুবুল?” গরম গরম শিঙাড়া খেতে খেতে বলল বনিদাদা। আসলে খানিক আগেই ব্যোমকেশ সংগ্রহ শেষ করার পর বনিদাদার এখন ব্যোমকেশ হ্যাংওভার চলছে।

“শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা গল্প এর আগে কখনও আমি পড়িনি। তবে এখন পড়তে বেশ ভাল লাগছে,” বুবুল বলল।

ইতিমধ্যে চা দিতে ঢুকেছেন কাকিমা। হাসতে হাসতে বললেন, “বুবুলের বয়স এখন কত যে, ও ব্যোমকেশ পড়বে।”

“হ্যাঁ, সেটা ঠিকই বলেছ। আমি গত কয়েকদিন পুরনো গোয়েন্দা গল্প পড়ছিলাম। একটা জিনিস কিন্তু মানতেই হবে, শার্লক হোম্‌স, এরকুল পোয়ারো, ফাদার ব্রাউন, ব্যোমকেশ বক্সী— এঁরা সবাই রহস্যের সমাধান করতেন কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই। যেভাবে গল্পের এইসব গোয়েন্দা রহস্যের জট খুলে ফেলতেন, তা এককথায় অবিশ্বাস্য, সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে,” চায়ে চুমুক দেওয়ার জন্য থামল বনিদাদা।



বুবুল এতদিন গোয়েন্দা গল্প পড়ত না। এখন আগাথা ক্রিস্টি বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই হাতে পেলে আর উঠতে চায় না। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেলেও সঙ্গে করে এইসব বই নিয়ে যায়।

“আচ্ছা বনিদাদা, গোয়েন্দাগিরির উৎস বা ইতিহাস নিয়ে কোনও তথ্য নেই তোমার হাতের কাছে?” প্রশ্ন করল বুবুল।

“এই নিয়ে প্রচুর ওয়েবসাইট পেয়ে যাবি ইন্টারনেটে। অনেক কিছু জানতে পারবি গোয়েন্দাগিরির ইতিহাস নিয়ে। পুরনো গোয়েন্দা গল্প নিয়েও আছে দারুণ সব তথ্য। যেমন, www kolkatapolice. com- এ গিয়ে আমাদের এখানকার গোয়েন্দাদের ইতিহাস পড়ে দেখতে পারিস। এ ছাড়া আছে পৃথিবী-বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এর সাইট। ওদের url-এর নাম, www.met.police.uk, ঘুরে আসতে পারিস www.fbi.gov এবং www.encarta.com সাইট থেকেও,” বনিদাদা বলল।

“এগুলো ছাড়া আর কোনও সাইট নেই?”

বুবুলের কথা শেষ হওয়ার আগেই বনিদাদা শুরু করল, “আছে বইকী। গোয়েন্দা গল্প নিয়ে কত লোক ডক্টরেট করে ফেলল। গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাস নিয়ে দারুণ কয়েকটা সাইট আছে। যেমন, www.suite101.com/article.cfm/3056/71800, এডগার অ্যালান পো-র সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গোয়েন্দাগিরির সমস্ত তথ্য পাবি এখানে। এ ছাড়া www.cwru.edu/artsci/engl/marling/hard boiled/early%20history.htm অথবা, www.trussel.com/detfic/detect.htm-এ ঘুরে আসতে পারিস। আর যদি অসুবিধে হয় তা হলে, bonnydada@rediffmail.com তো আছেই।”

ছবি: দেবাশিস দেব



ধারাবাহিক উপন্যাস



সমরেশ মজুমদার

কেউ বোঝে না

আগে যা ঘটেছে: একদিন পাতাল রেলে একজন সন্দেহজনক অপরিচিত লোক অমৃতর সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করেছিল। অমৃতর মা-বাবা দু'জনেই চাকরি করেন। মা'র কথা শুনতে তার ইচ্ছে করে না। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অমৃতর দুই মেয়ে-বন্ধু স্যান্ডা আর ইশার সঙ্গে দুটি ছেলে অসভ্যতা করার চেষ্টা করে। পরে শিউচরণের ভয়ে তারা পালিয়ে যায়। পরদিন স্কুল ছুটি থাকায় বাবা অমৃতকে ধানগাছ দেখাতে গ্রামে নিয়ে যান। গ্রামে বাবার মামার বাড়িতে যায় অমৃতরা। বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় মা রাগ করেন। স্যান্ডার মার সঙ্গে ফোনে কথা হয় মায়ের। তিনি বলেন অমৃতকে এখন একা ছাড়া উচিত। মা রেগে অমৃতকে একা স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তারপর...

১৭

সকালে টেবিলে বসে অমৃত যখন দুধ-চা খাচ্ছিল, তখন বেল বাজল। কেউ খোলার আগেই অমৃত দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলতেই মাকে দেখতে পেল। সে অবাক।

মা কখনও সকালে বাইরে বের হয় না। সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, "কোথায় গিয়েছিলে?"

হনহনিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল মা, "তোমাকে সাবালক করার ব্যবস্থা করতে।"

কথাটা বুঝতেই পারল না অমৃত। টেবিলে ফিরে এসে দুধ-চা শেষ করতেই বাবা বেরিয়ে এল, এসে টেবিলে বসল। যমুনাদি চা আর বিস্কিট দিয়ে গেল, সঙ্গে খবরের কাগজ। তারপর মায়ের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল, "চা আনব?"

মা বেরিয়ে এল, "হ্যাঁ, খেতে তো হবেই।"

মা চেয়ার টেনে বসতে বাবা জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"আমার কী হবে? আমার কিছু হয় না।"

একটা ইংরেজি, অন্যটা বাংলা কাগজ। বাংলা কাগজ মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বাবা বলল, "সাতসকালে এইসব বাক্য কেউ ঠান্ডা মাথায় বলে না।"

মা তাকাল অমৃতর দিকে, "হাঁ করে কথা গিলতে খুব ভাল লাগে, না? এইটুকু বয়সে বড়দের হাবভাব নকল করছ? যাও, বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাথরুমে ঢোকো। দারোয়ানকে বলে এসেছি, তাকে দরকার নেই। আজ থেকে তুমি একাই যাবে।"

সে অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। কাল রাত্রে যে কথা মা বলেছে, তা সত্যি করতে সকাল হতেই বেরিয়ে গিয়ে দারোয়ানকে বলে আসবে, এতটা সে ভাবতে পারেনি।

বাবা বলল, "তুমি কি সত্যি দারোয়ানকে নিষেধ করে এসেছ?"

"হ্যাঁ।" মা চায়ে চুমুক দিল, "ওকে বড় হতে দিচ্ছি — !"

"শোনো, মাথা গরম করে কোনও লাভ নেই।"

"আমার মাথা যথেষ্ট ঠান্ডা। অ্যাই, তুই একা স্কুলে যেতে পারবি না?" মা সরাসরি তাকাল অমৃতর দিকে।

কী জবাব দেবে বুঝতে না পেরে অমৃত বলল, "পারব।" তার গলা খুব করুণ শোনাল।

মা আবার চায়ে চুমুক দিল। বাবা জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে স্কুলে যাবে?"

অমৃত গম্ভীর হয়ে বলল, "এখান থেকে হেঁটে টিউব স্টেশনে যাব। ওখানে গিয়ে ট্রেনে উঠব। স্কুলের স্টেশনে নেমে একটু হাঁটলেই তো গেট।"

মা চাপা গলায় বলল, "রাজ্য জয় করে এসো।"

বাবা বলল, "এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে না। গেটের বাইরেই রিকশা দাঁড়িয়ে থাকে। যাওয়া-আসা দশটাকায় হয়ে

যাবে।"

মা তাকাল, "এখন থেকে প্রত্যেকদিন বেরুবার আগে দয়া করে টাকাটা নিয়ে যেও। ট্রেনের টিকিট আমি কেটে দেব।"

"তোদের স্কুলের কাছে কোনও পি সি ও আছে?" বাবা জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। গেটের পাশেই আছে।"

"স্কুলে ঢোকার আগে আমার মোবাইলে ফোন করবি।"

মাথা নাড়ল অমৃত।

স্নান করার সময় সে বেশ উত্তেজিত ছিল। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যখন খেতে বসল, তখন বাবা বাথরুমে। মা এসে জিজ্ঞেস করল, "টিফিন নিয়েছ?"

যমুনাদি বলল, "দিচ্ছি।"

"এই নাও দুটো পাঁচটাকার কয়েন, ফোনের জন্য দু' টাকা আর এই দশটাকার নোটটা ব্যাগে আলাদা করে রেখে দেবে, খুব প্রয়োজন না হলে খরচ করবে না।" মা টাকাগুলো টেবিলে রেখে নিজের ঘরে চলে গেল।

খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকে অমৃত দেখল যমুনাদি ব্যাগে টিফিনবাক্স ঢোকাচ্ছে। তাকে দেখে বলল, "একা যাবে, তোমার ভয় করছে না?"

"কেন? আমি কি তোমার মতো ভিতু?"

"হুম! শোনো, বেশি সাহসী হওয়া ঠিক না। কেউ যদি এসে বলে তোমার মা-বাবা ওখানে আছে, এসো, তা হলে কক্ষনো যেও না।" যমুনাদি উপদেশ দিল।

"জানি, জানি!"

"কেন যে কাল কোনও খবর দিলে না — , তা হলে আজ একা যেতে হত না।"

যমুনাদির দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অমৃত ব্যাগ তুলে নিল। বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখল মা দাঁড়িয়ে আছে, "দয়া করে ফোন কোরো। যমুনা, ব্যাগটা রিকশায় তুলে দিয়ে এসো।"

"না, আমি পারব।" ব্যাগটাকে জোরে আঁকড়ে ধরল অমৃত।

লিফ্‌টে নামবার সময় হঠাৎ পায়ের তলা শিরশির করে উঠল অমৃতর। মাঝে একদিন যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য পাতালরেল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেরকম হলে কী করবে? সেদিন ওরা মিনিবাসে চেপে গিয়েছিল। ভিড়ের চাপে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, দারোয়ান ব্যাগ নিয়েছিল বলে বেঁচে গিয়েছিল সে। এতবড় কলকাতা শহর, লক্ষ লক্ষ মানুষ আর অচেনা মানুষের দশজনের নয়জনই ভয়ঙ্কর, তখন কী করবে?

নীচে নেমে গেটের দিকে হাঁটার সময় খেয়াল হতে অমৃত পিছনে তাকাল। মা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। তাকে ঘুরতে দেখে হাত নাড়ল। অমৃত খুব দুর্বল ভঙ্গিতে হাত তুলে নাড়তেই চোখে পড়ল, সেই মেয়েটাও তাদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে তাকে হাত নাড়ছে। চকিতে সতর্ক হয়ে আবার গেটের দিকে হাঁটতে লাগল অমৃত। শিউচরণ দারোয়ান এখন তার জায়গায় নেই। রাস্তায় এসে খানিকটা দূরে রিকশা দেখতে পেল সে। সেদিকে হাঁটতেই গলা ভেসে এল, "অ্যাই মিত!"

অমৃত পিছনে ফিরল, বাবলু আর টুকাই আসছে। কাছে এসে টুকাই জিজ্ঞেস করল, "কী রে, আজ তুই একা?"

"এখন থেকে আমি একাই যাব।"

"বাঃ! তা হলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।" বাবলু বলল।

"তোমরা তো ওই মোড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে।"

"ওখান থেকে তোর স্টেশন তো তিন মিনিট।" টুকাই বলল।

"বাবা বলেছিল রিকশায় যেতে।"

"দুর! এইটুকু রাস্তা কেউ রিকশায় যায় নাকি! রিকশার ভাড়া জানো?"

"জানি, এক পিঠে পাঁচ টাকা। মা দিয়ে দিয়েছে।"

"বাঃ! হেঁটে গেলে রোজ দশটাকা বাঁচবে। তার মানে সপ্তাহে পঞ্চাশ টাকা, মাসে দুশো। উরিব্বাস! খাওয়াতে হবে কিন্তু!" টুকাই বলল।

ওরা হাঁটছিল। কিন্তু ভয় শুরু হল অমৃতর। একটু পরেই মা-বাবার বের হওয়ার কথা। যদি তাকে রাস্তায় হাঁটতে দ্যাখে, তা হলে আর রক্ষে থাকবে না। আশঙ্কার কথা সে বন্ধুদের বলল। বাবলু বলল, "ইচ্ছে থাকলেই উপায় বের করা যায়। চল, ওই গলি দিয়ে যাই, একটু সময় বেশি লাগবে। জোরে হাঁটলে ম্যানেজ হয়ে যাবে।"

দু'পাশে বাড়ি, মাঝখানে সরু রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে অমৃতর মনে হল, বেশ অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে। বাবা বা মা, কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। একসময় বাবলু বলল, "তুমি সোজা চলে যাও। বাঁ দিকে ঘুরলেই স্টেশন দেখতে পাবে।"

মাথা নাড়ল অমৃত। তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগল। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একজন প্রৌঢ় তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে খোকা, কোন স্কুল?" অমৃত জবাব দিল না। পাতালরেলের স্টেশন চোখে পড়ার পর তার উত্তেজনা কমল। সে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতেই চিৎকার কানে এল। দরজার কাছে এসে ইশাকে হাত নাড়তে দেখে সে ওই কামরায় উঠে পড়ল। তিনজনের সিটে বসে আছে স্যান্ডা। ইশা তার পাশে বসে বলল, "আয়। তুই আজ একা? তোর হনুমান সঙ্গে এল না কেন?"

"হনুমান!"

স্যান্ডা হাসল, "লোকটাকে রিকশা-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।"

"রিকশা-স্ট্যান্ডে?" অমৃত অবাক, "ঠিক দেখেছিস?"

ঠোঁট টিপে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল স্যান্ডা। ধক করে উঠল বুক। শিউচরণ রিকশা-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? তবে কি মা বলেছে ওকে ওখানে দাঁড়াতে? তার রিকশায় আসার কথা। তাকে একা যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে মা কি শিউচরণকে বলেছে অনুসরণ করতে? যেহেতু সে অন্য পথে হেঁটে এসেছে, তাই শিউচরণ তাকে দেখতে পায়নি। না পেয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই বলবে, সে স্টেশনে যায়নি। তার আগে বাবা-মা বেরিয়ে পড়লে যমুনাদি পড়বে টেনশনে। পড়ুক!"

ইশা জিজ্ঞেস করল, "লোকটা তোর সঙ্গে এল না কেন রে?"

"এখন থেকে আমি একাই যাওয়া-আসা করব।" গম্ভীর গলায় বলল অমৃত।

সঙ্গে সঙ্গে স্যান্ডা এমন উঁচু গলায় চিৎকার করে ব্যাগ চাপড়াতে লাগল যে, কামরার অন্য যাত্রীরা কৌতূহলী হয়ে ওদের দিকে তাকাল। সেই চিৎকারে যোগ দিল ইশাও। যেন বিরাট জয় হয়ে গিয়েছে, এমন ভঙ্গি ওদের। স্যান্ডা বলল, "নে, হাত মেলা। আজ থেকে তুই মানুষ।"

"তার মানে? আমি কাল মানুষ ছিলাম না?" প্রতিবাদ করল অমৃত।

"ছেলেমানুষ ছিলি। কচি খোকা, নাড়ুগোপাল হয়ে ছিলি।"



কেউ বোঝে না

ইশা বলল, "কনগ্র্যাট্‌স!" ট্রেন ছেড়ে দিল।

সহপাঠিনীদের এইসব কথায় এখন বেশ ভাল লাগল অমৃতর। ছুটন্ত ট্রেনে বসে প্রথমে মনে হল, শিউচরণের ব্যাপারটা ম্যানেজ করা সোজা। সে রিকশায় যখন স্টেশনে পৌঁছেছে, তখনও শিউচরণ যদি ওখানে না গিয়ে থাকে, তা হলে তাকে দেখবে কী করে? তা ছাড়া শিউচরণ যে তাকে দেখার জন্য ওখানে অপেক্ষা করবে, তা জানলে সে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যেত। এটা শুনলে মা জেরা বন্ধ করবে। তার পরেই কয়েনটার কথা খেয়াল হল। পাঁচ টাকার কয়েন। রিকশায় না ওঠায় কয়েনটা এখন তার হয়ে গেল। এটা খরচ করার জন্য কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। রোজ যদি দশটাকা বাঁচাতে পারে, তা হলে কুড়িদিনে দুশো টাকা। কিন্তু এত টাকা সে রাখবে কোথায়? তার তো কোনও নিজস্ব জায়গা নেই। তার আলমারি, ডেস্ক ইত্যাদি জায়গাগুলোয় মা তো বটেই, যমুনাদিও স্বচ্ছন্দে হাত দিতে পারে। একটা ভাল লুকোবার জায়গা খুঁজতে হবে।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই প্রচুর যাত্রী উঠলেন। অমৃত দেখল, সেই ছেলেদুটো, যারা রোজ স্যান্ডাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েকটা স্টেশন পর্যন্ত যায়, তারাও উঠেছে। মেয়েরা যে এই কম্পার্টমেন্টে উঠবে, তা ওরা নিশ্চয়ই জানে।

লম্বা ছেলেটা সামনে এসে একগাল হাসল, "হা-ই!"

স্যান্ডা বলল, "হাই! ইউ লুক রিয়েল হ্যান্ডি!"

ছেলেটা কাঁধ নাচাল, "স্কুল বাঙ্ক করবে?"

স্যান্ডা চোখ বড় করল, "ও মা! কেন?"

"গ্লোবে একটা দারুণ ছবি এসেছে!" ছেলেটা বলল।

"ওঃ নো! আজ ক্লাসে যেতেই হবে। মা স্কুলে যেতে পারে।" ইশা বলল।

"হোয়াই?" ছেলেটা ইশার দিকে তাকাল।

"আগের দিন একটা ছেলে টিজ করছিল, তাই।" ইশা বলল।

"কে ছেলেটা? ইউ নো হিম?"

"ডোন্ট টক রাবিশ! চেনা ছেলে আমাকে টিজ করবে কেন?" ঝাঁঝিয়ে উঠল স্যান্ডা, "বোধ হয় লোকাল মাস্তান। বলল, তোমার যদি বয়ফ্রেন্ড থাকে, তা হলে তাকে নিয়ে এসো।"

"ওকে আসতে বলো কালীঘাটে।" খাটো ছেলেটা বলল।

"আমার কী দরকার? আমাকে স্কুল করতে হবে। কোনও ঝামেলায় নেই বাবা!" স্যান্ডা হসল।

"তার মানে ওকে তুমি চান্স দিচ্ছ।"

"এখনও ভাবিনি।"

ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল ওদের, তাই অমৃত সবই শুনতে পাচ্ছিল। সে বেশ বিব্রত বোধ করছিল ওইসব সংলাপে। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই আচমকা লম্বা ছেলেটা 'বাই' বলে খাটোকে ইশারা করে নেমে গেল। খাটো ব্যাপারটা বুঝে নামতে পারল শেষ মুহূর্তে। কিছু লোক উঠল, কিন্তু ততক্ষণে স্যান্ডা খিলখিল করে হেসে উঠেছে। ইশা চাপা গলায় ধমকাল, "অ্যাই!"

হাসি থামিয়ে স্যান্ডা বলল, "কাওয়ার্ড!"

ইশা বলল, "তুই কাটিয়ে দিলি। আর আসবে না। রোজ বেশ মজা হত!"

"বোরিং! একই কথা রোজ! ওই স্টেশনে উঠবে আর কয়েকটা স্টেশন পরে নামবে। নেমে প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হবে না। উলটোদিকের ট্রেনে উঠে ফিরে যাবে ওই একটা টিকিটে। তা ছাড়া এরকম কাওয়ার্ড ছেলের সঙ্গে কথা বলাই অন্যায়।" স্যান্ডা স্পষ্ট গলায় বলল।

স্কুলের স্টেশনে নামল ওরা। ইশা বলল, "যদি উপরে উঠে দেখি ওই ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য, তা হলে কী হবে?"

"কী আর হবে! লড়ে যাব। আমরা কি কিছু কমতি আছি!" স্যান্ডা বলল, "তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে মিত আছে। কী রে মিত, তুই আমাদের হেল্প করবি না?"

অমৃত হাসল। উপরে ওঠার পর দেখা গেল সেই ছেলেটা দৃষ্টিসীমায় নেই। হাঁটতে হাঁটতে অমৃত জিজ্ঞেস করল, "অচেনা ছেলেদের সঙ্গে তোরা ওসব কথা বলিস কেন?"

"জাস্ট ফর ফান।" ইশা জবাব দিল।

"ফান?" অবাক হল অমৃত।

"তুই এখন বুঝবি না। আর একটু বড় হ।" স্যান্ডা বলল।

"বাজে বকিস না। তোরা বুঝলে আমি বুঝব না কেন? আমরা তো সমবয়সী।"

স্যান্ডা বলল, "এর উত্তরটা তোকে পরে দেব।"

"তোরা যেন সব বুঝে বসে আছিস! আচ্ছা, ধানগাছ দেখেছিস? ধানগাছের কাঠ?"

দুটি মেয়ে হকচকিয়ে গেল। ইশা বলল, "ধানগাছ তো ছোট ছোট, কাঠ হবে কী করে?"

"তা হলে ধানগাছ বলে কেন? আমগাছ, ইউক্যালিপটাস গাছ আর ধানগাছ তো এক নয়, তা হলে গাছ বলে কেন?" অমৃত চুপ করল কয়েক সেকেন্ড, "জানিস না? বল তো, খাটা পায়খানা কী? বলতে পারবি? কিছুই জানিস না, অথচ — !" কথা শেষ না করে অমৃত হনহন করে পি সি ও-তে ঢুকে পড়ল। ওদের জব্দ করে তার বেশ আনন্দ হচ্ছিল।

বাবাকে ফোন করল অমৃত। তার গলা শুনেই বাবা জিজ্ঞেস করল, "পৌঁছে গেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কোনও অসুবিধে হয়নি? ভয় পাওনি?"

"না।"

"ঠিক আছে। গুড বয়। ফেরার সময় সাবধানে ফিরবে।"

"বাড়ি ফিরে কি ফোন করব?"

"কোরো। রাখছি।"

ফোন রেখে সে কাউন্টারে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "কত দেব?"

লোকটি হাসল, "তুমি দেড়টাকা দাও।"

দুটো টাকা দিতে পঞ্চাশ পয়সা ফেরত পাওয়া গেল। রাস্তায় নেমেও অমৃত বুঝতে পারছিল না, মা কেন দুটো টাকা বলেছিল। মা কি জানে না? কিন্তু তার তো পঞ্চাশ পয়সা লাভ হয়ে গেল। কিন্তু সে মাথা নাড়ল, এই পঞ্চাশ পয়সা সে মাকে ফেরত দিয়ে দেবে। বলবে, লোকাল কলের চার্জ তুমি জানো না।

ক্লাস হচ্ছিল রোজ যেমন হয়। কিন্তু শোভন আজ তার পাশে বসেনি। এরকম সাধারণত হয় না। অন্য বেঞ্চিতে বসা শোভন তার দিকে তাকাচ্ছেও না। দুটো ক্লাসের মাঝখানের সময়টায় যখন ক্লাসে কোনও টিচার নেই, তখন অমৃত চেঁচিয়ে

ডাকল, "অ্যাই শোভন!"

শোভন তাকাল না। শুধু হাতটা বিশ্রীভাবে নাড়ল, যার মানে ও বিরক্ত হতে চায় না। টিফিন-টাইমে সে শোভনকে ধরল, "অ্যাই, তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস না কেন?"

শোভন বিশ্রী মুখ করে বলল, "যা যা! আমি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি না।"

"কী বললি? আমি মেয়ে?" হতভম্ব হয়ে গেল অমৃত।

"নয় তো কী? রোজ দারোয়ানের সঙ্গে আসিস, আজ দুটো মেয়ে তোকে এসকর্ট করে নিয়ে এল।"

"ওদের সঙ্গে ট্রেনে দেখা হয়েছে। আমাকে কেন আনবে?"

প্রশ্নটা শুনে চোখ ছোট করল শোভন, "তোদের দারোয়ানটা এল না কেন?"

"ওকে নিষেধ করে দিয়েছে মা। এখন থেকে আমি একাই আসব।"

"সত্যি?" চোখ বড় হল শোভনের।

"হ্যাঁ। আর মেয়েদের সঙ্গে তুই কথা বলিস না? তা হলে সিনেমায় গিয়েছিলি কেন?"

"আমি ওদের নিয়ে গেছি? তোর পিছন পিছন ওরা গিয়েছিল।" শোভন বলল, "ওই স্যান্ডা মেয়েটার হাবভাব আমার ভাল লাগে না। তুই তো বলেছিলি, পাতালরেলে ওর বয়ফ্রেন্ড আছে।"

"সে আজ চলে গেছে। ছেলেটা নাকি খুব কাওয়ার্ড, তাই স্যান্ডা ওকে কাটিয়ে দিয়েছে।"

"ছেলেটা কাওয়ার্ড, ও জানল কী করে?"

"সেটা ওকে জিজ্ঞেস কর। তোকে আমি বন্ধু বলে ভাবতাম। ঠিক আছে, আর ভাবব না।"

কথাগুলো বলে চলে যাচ্ছিল অমৃত, শোভন দৌড়ে এসে ওর হাত ধরল, "সরি।"

হাত ছাড়িয়ে নিল অমৃত। শোভন বলল, "ওদের সঙ্গে তোকে পাতালরেল থেকে বেরোতে আর কথা বলতে দেখে আমার খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। তোকে কতবার ফোন করেছি, তুই বাড়িতে ছিলি না। আমি সরি।"

স্কুল শেষ হলে শোভনের সঙ্গে বের হল অমৃত। গল্প করতে করতে পাতালরেলের গেট পর্যন্ত এসে শোভন চলে গেল। একা একাই নীচে নামল অমৃত। তখনই চোখে পড়ল, পাতালরেলের প্ল্যাটফর্মের কাছের সিঁড়িতে ওরা বসে আছে। স্যান্ডা তাকে দেখে বলল, "আয়, বোস।"

"তোরা এখানে বসে আছিস! জুতোর ধুলোর মধ্যে।"

"তুই একটা যাচ্ছেতাই! এখানে বসার আলাদা চার্ম আছে।" ইশা বলল।

তবু অমৃত বসছে না দেখে ওরা উঠল। দূরে দাঁড়ানো একটি সুদর্শন তরুণকে দেখিয়ে স্যান্ডা বলল, "আবার তাকাচ্ছে। কেমন লাল মুলোর মতো দেখতে, না?"

"হৃতিক রোশন!" হাসল ইশা।

"আলাপ করবি?" স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল।

অমৃত রেগে গেল, "অ্যাই, তোরা অচেনা ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিস কেন রে?"

"সবার সঙ্গে বলি না। এসব তুই বুঝবি না।" ইশা বলল।

স্যান্ডা জিজ্ঞেস করল, "তোদের ভাব হয়ে গেল? শোভন আর তোর?"

"হ্যাঁ। ও ভুল বুঝেছিল, সরি বলেছে।" অকপটে বলল অমৃত।

"বাঃ! তোরা মেড ফর ইচ আদার! কিন্তু কে মেল, কে ফিমেল?" স্যান্ডার প্রশ্ন শুনে হি হি করে হাসতে লাগল ইশা।

(ক্রমশ)

দেবতার হাত

অনির্বাণ বসু



ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে কয়েক বছর আগে, আকিদার গোয়েন্দাগিরির সেটাই ছিল প্রথম প্রকাশ। প্রশ্ন উঠতে পারে, এতদিন পর লিখছি কেন? প্রথমত, তখন স্কুলে পড়তাম, লেখার হাতটা তেমন তৈরি হয়নি (অবশ্য এখনও যে হয়েছে, এমন দাবি করছি না), তা চেয়েও বড় ব্যাপার হল, তখনই লিখলে এবং প্রকাশ করলে বাবাকে তাঁর কাজের জায়গায় অসুবিধেয় পড়তে হত। লিখেই প্রথমে আকিদাকে দেখিয়েছিলাম। নিজের স্টাইলে বলল, "চললেও চলতে পারে, তবে বেশি ফ্যানাস না। স্ট্রেট ব্যাটে না খেললে পাঠক পাবি না।"

শুরুর তারিখটা ছিল ছাব্বিশে নভেম্বর, আমার বেশ মনে আছে, সেটা ছিল শুক্রবার। পরপর দু'দিন ছুটি বলে স্কুল থেকে ফেরার পরই খুশি খুশি লাগছিল। বসার ঘরে ঢুকে দেখলাম আকিদা খুব মন দিয়ে একটা বই দেখছে।

আমাকে দেখে ডাকল। একটা ছবি দেখিয়ে বলল "কী দেখছিস?"

আবার বই? বিরক্তি চেপে এগোলাম।

"তিনটে স্ট্রেট লাইন, একটা পয়েন্টে কাট করে চলে যাচ্ছে, আর সেগুলোকে জোড়া হয়েছে আরও ছ'টা লাইন দিয়ে।"

"ঠিক করে দেখে বল।"

"দাঁড়াও,... একটা ষড়ভুজের সবক'টা পয়েন্ট জোড়া হচ্ছে তিনটে স্ট্রেট লাইন দিয়ে, আর... না, না, ছ'টা ত্রিকোণ।" আমি কনফিডেন্টলি বললাম।

"তুই সেই বোড়ে তো বোড়েই রয়ে গেলি।" এবার আকিদার গলায় বিরক্তি।

আমার ডাকনাম জুনো। তবে মাঝেমধ্যেই এই বিচ্ছিরি নামটা আকিদা ব্যবহার করে।

"তুমিই তো বললে..."

"ঠিক করে দ্যাখ ইডিয়ট," — বাধা দিয়ে বলল আকিদা। হঠাৎ একটা খুব চেনা জিনিস চোখের সামনে ভেসে উঠল।

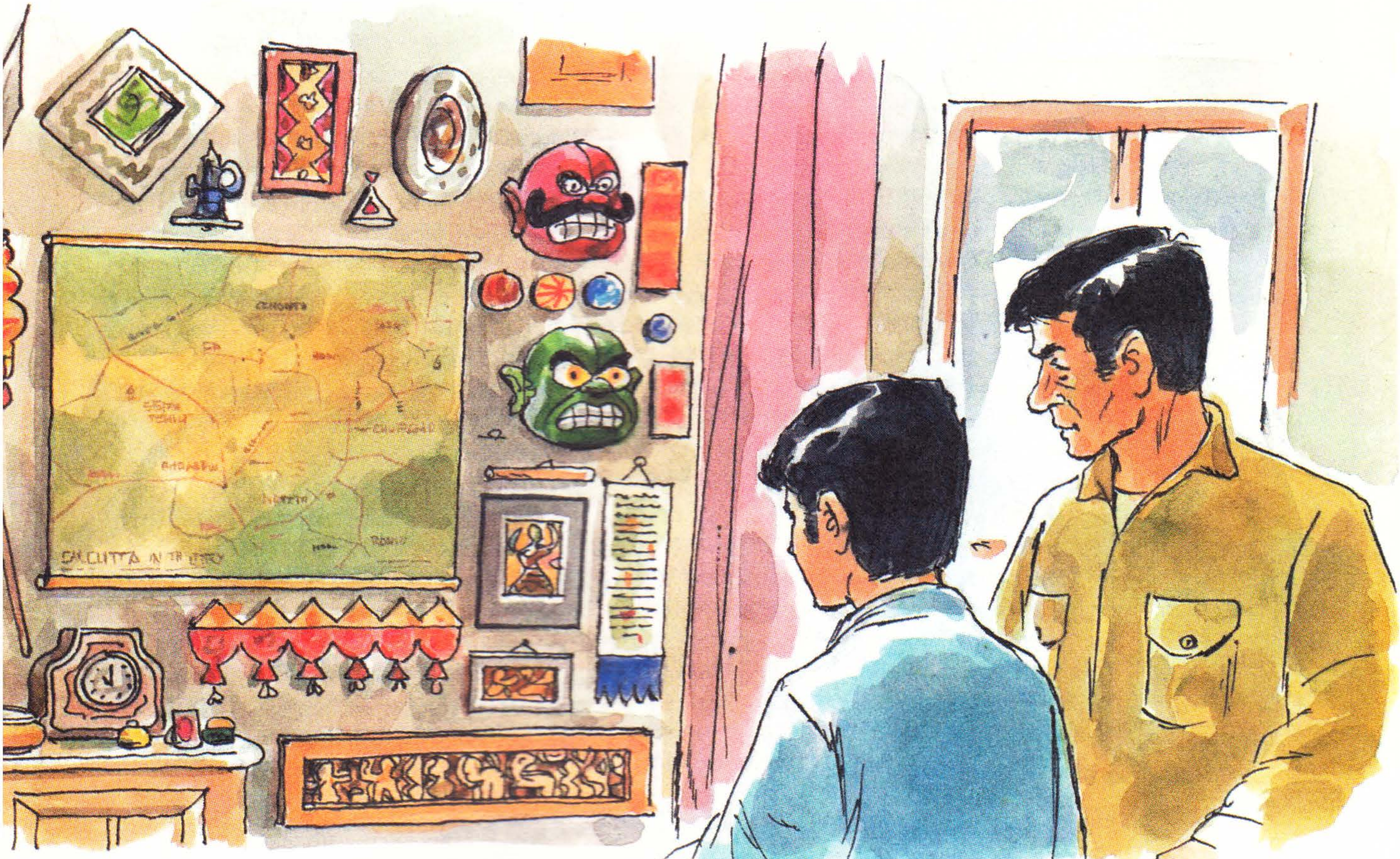
"আরে, এটা তো একটা কিউব!" খুব অবাক হয়ে বলে উঠলাম।

"চোখটা খুলেছে এতক্ষণে। শোন, আমার সঙ্গে থাকতে গেলে পর্যবেক্ষণ আর পারসেপশন, এই দুটো ব্যাপার নিয়ে মাজাঘষা করতে হবে তোকে। সব সময় ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখবি।"

আমি ততক্ষণে বসে গেছি বইটা নিয়ে। দারুণ ইন্টারেস্টিং তো! এত মশগুল হয়ে গিয়েছিলাম যে, বুঝতে পারিনি কখন বাবা এসেছেন ঘরে। আকিদা নিশ্চয়ই পেরেছিল, কারণ ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই আমার খেয়াল হয়েছিল। ও বাবাকে খুব শ্রদ্ধা করে। বলে রাখি, বাবা ওর মামা হন। বেশ কিছুদিন হল আকিদা আমাদের সঙ্গে এখানেই আছে।

সবে অফিস থেকে ফিরেছেন বাবা, এখনও ব্রিফকেসটা পর্যন্ত হাত থেকে নামিয়ে রাখেননি। এমনিতে বসার ঘরে এভাবে কখনও আসেন না বাবা, যখন এসেছেন, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।

"জানিস আকি, আমার এক কোলিগ, নাম সুশান্ত সরকার,



তারই এক ক্লোজ বন্ধুর বাড়িতে একটা অদ্ভুত ধরনের চুরি হয়েছে।"

আকিদা চুপ করে অপেক্ষা করছে বাবার কথা শেষ হওয়ার জন্য।

"সুশান্ত ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার," বাবা আবার আরম্ভ করলেন। "সেখানকারই এক বন্ধু — নাম অমিত দেববর্মন — মনে হয় তাসের পার্টনার — বলেছে, ওর বাড়িতে একটা মূর্তি চুরি হয়েছে। অমিতের বাবা নাকি শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধ মানুষ, শরীর এমনিতেই খারাপ থাকে, আরও ভেঙে পড়েছেন। পুলিশও এসেছিল, কিন্তু কিছু করতে পারেনি। ওদের জেরার চোটে নাকি ভদ্রলোকের শরীর আরও খারাপ হবার উপক্রম। সুশান্ত আমার অ্যাডভাইস চাইছিল, আমি স্রেফ বলেছি, আমার ভাগ্নেকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।" গলাটা খাঁকরে নিয়ে বললেন বাবা, "তুই একবার দেখবি নাকি?"

আকিদা চুপ।

আমি দমবন্ধ করে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। সত্যিই কেসটা হাতে নেবে নাকি? মূর্তি চুরির সমাধানে নেমে যদি সাকসেসফুল না হয়, তা হলে খুব মুশকিল হবে যে! আর... আমাকে যদি সঙ্গে না নেয়? টেনশনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাবা সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন আকিদার দিকে। আকিদা কী যেন ভাবছে। অবশেষে মুখ খুলল।

"তুমি যখন বলছ, তখন নিশ্চয়ই দেখব একবার।"

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বাবা, "তা হলে আজই সুশান্তকে একটা ফোন করে দিই। অমিত দেববর্মনের সঙ্গে কথা বলে ও-ই একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করে রাখুক।"

বাবা ঘরের বাইরে বেরোতেই আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল আকিদা।

"আমি তোমার সঙ্গে যাব," সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম আমি। বাবা কি শুনতে পেলেন? একবার পরদা সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন দেখে আমার সন্দেহ হল। তবে আপত্তি না করলেই ঠিক আছে।

"শোন বোড়ে, এক নম্বর কন্ডিশন হল, আমার সঙ্গে বেরোলে তুই কিন্তু বেশি কথা বলবি না। দু' নম্বর, যা করতে বলব, তার বাইরে কিচ্ছু করবি না।"

খাবার টেবিলে বাবা জানিয়ে দিলেন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্সড। পরদিন সকাল ন'টার সময় ১/২/১ বালিগঞ্জ প্লেস ইস্টে গিয়ে দেখা করতে হবে।

রাতে ভাল করে ঘুমই হল না। পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, তখনও সকাল হয়নি। আকিদা যা হেল্‌থ কনশাস, ঠিক মর্নিং ওয়াকে বেরোচ্ছে। আমাকে বলল, "ঘুমিয়ে পড়, ন'টা বাজতে এখনও অনেক দেরি।"

আমাদের বাড়ি থেকে আধঘণ্টার পথ অমিত দেববর্মনের বাড়ি। ন'টা বাজার মিনিটকয়েক আগে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম

১/২/১ বালিগঞ্জ প্লেস ইস্টে। দেখলাম আকিদা মন দিয়ে চারপাশটা দেখছে। কী দেখছে অবশ্য বুঝলাম না, আমার চোখে তেমন কিছুই পড়ল না। দুটো পুরনো বাড়ির মাঝে অনেকটা জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়িটা। তবে তফাত গড়ে দিয়েছে সামনের বাগান, অন্য বাড়ি দুটোতে এত বড় বাগান নেই। বাঁ দিকে একটা গ্যারাজ, একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। গাড়ি বারান্দাও আছে, তার নীচে দাঁড়িয়ে আছে একটা টুকটুকে লাল মারুতি। দেখতে কিন্তু বেশ বেখাপ্পা লাগছে, অতবড় বারান্দার নীচে একটা পুঁচকে গাড়ি! হাসি পাচ্ছিল আমার। আকিদার দিকে তাকিয়ে দেখি, ও গম্ভীর মুখে ডানদিকের গেটটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বলতে ভুলে গেছি, বাড়িটার দুটো গেট, আমরা দাঁড়িয়ে আছি বাঁদিকের গেটে, ডানদিকেরটার সামনে একটা হাতে টানা রিকশা উলটে রাখা আছে। দেখে মনে হয়, ওটা কেউ ব্যবহার করে না।

"ঘড়িটা দ্যাখো বোড়ে, ন'টা প্রায় বাজে। চলো।"

আমি এগিয়ে লোহার গেটটা ঠেললাম, খুলল না।

"সর তো," আকিদা একটা মৃদু চাপ দিতে ক্যাঁচ করে খুলে গেল দরজা। আমরা এগোলাম গাড়ির রাস্তার দিকে।

আরও কাছে আসতেই ভাল করে দেখতে পেলাম গ্যারাজে দাঁড় করানো গাড়িটা। বিরাট গাড়ি। চারটে চাকা ছাড়াও বনেটের দু'পাশে লাগানো আছে আরও দুটো। চাকায় আবার সাইকেলের চাকার মতো স্পোক লাগানো। সন্দেহ নেই, খুব পুরনো গাড়ি, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ভিনটেজ'।

"জাগুয়ার," চাপা গলায় বলল আকিদা।

"কেমন করে বুঝলে?"

"ম্যাসকট দেখে।"

পরে জেনেছিলাম, গাড়ির রেডিয়েটারের ঢাকনার উপর খোদাই করা স্টিলের মূর্তিটাকে বলে ম্যাসকট।

সেমি সার্কুলার ড্রাইভওয়ে দিয়ে, লাল মারুতির পাশ কাটিয়ে, তিনটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যখন কলিং বেল টিপছি, তখন পিঁক পিঁক করে আকিদার কোয়ার্টজ ঘড়ি জানাল যে, ন'টা বাজে। বাড়িতে ঢোকার দরজাটা কাঠের, তবে খুব একটা চকচকে নয়।

দরজা খুললেন একজন খুব বয়স্ক দেখতে মানুষ। নভেম্বর মাসে ঠাণ্ডাই পড়েনি, কিন্তু তা-ও দেখলাম গলায় মাফলার জড়ানো। ইনিই কি অমিত দেববর্মন?

"কিসকো চাই?"

হিন্দি-বাংলা মেশানো অদ্ভুত প্রশ্ন। আকিদা জবাব দেওয়ার আগেই মাফলারওয়ালার পিছন থেকে শোনা গেল আর একটা গলা।

"আর ইউ মিস্টার ডে?" প্রায় সাহেবদের মতো ইংরেজি উচ্চারণ। এবার দেখতে পেলাম ভদ্রলোককে। গাঢ় সবুজ পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরা, বেশ সুপুরুষ। হাতে একটা ইংরেজি পত্রিকা, পরে আকিদা বলেছিল, ওটা আমেরিকান কাগজ 'এসকোয়ার'। চুলগুলো বেশ পাতলা, কানের পাশে সাদার ছোপ লেগে গেছে। লম্বায় প্রায় আকিদার মতোই, তবে ওর মতো স্লিম নন, বেশ ভারী চেহারা।

আকিদা ঘাড় নাড়ায় উনি বললেন, "আই হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্যাট ইউ আর পাংচুয়াল। আমি অমিত দেববর্মন।"

পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার পর অমিতবাবুর সঙ্গে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আকিদা জিজ্ঞেস করল, "গ্যারাজের ভিনটেজ কারটা কি আপনার?"

"পাগল হলেন নাকি? নেহাত বাবার শখের জিনিস তাই এখনও আছে, আমার হলে কবে বিদায় করে দিতাম।"

দোতলায় উঠেই একটা ছোট ল্যান্ডিং। তার পাশেই একটা ঘর। যদিও সেটার দরজা খোলা, সামনে পুরু পরদা ঝোলানো। ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে অমিতবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, "প্লিজ, বাবা আপনাদের এক্সপেক্ট করছেন।"

ঘরে ঢুকেই চোখ চলে যাবে দেওয়ালে। দাঁত খিঁচিয়ে থাকা নেপালি মুখোশ, সিল্কের কাপড়ের উপর সুন্দর একটা বুদ্ধের মুখ, রংবেরঙের পাথর বসানো নকশা কাটা ছোরা, ছুঁচলো মুখওয়ালা দুটো বর্শা, বহু পুরনো কলকাতার ম্যাপ — আরও নানা হিজিবিজি জিনিসে বোঝাই দেওয়ালটা। তার ঠিক নীচে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামার উপর খুব দামি সিল্কের কাপড়ের রংচঙে একটা কিমোনো পরা বয়স্ক মানুষটি একটা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

অমিতবাবু এগিয়ে গেলেন, "ইনি মিস্টার দে। তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন — হয়তো।"

প্রতি নমস্কার করে আকিদা আমার পরিচয়টাও দিল।

বেশ মন দিয়ে শুনে ভদ্রলোক মুখ খুললেন। গলার আওয়াজটা বেশ খোনা। "আমি শ্যামসুন্দর দেববর্মন। তোমাকে তুমিই বলি, কেমন?"

"নিশ্চয়ই।"

আমার চোখ সরছিল না বর্শা দুটো থেকে। সেটা লক্ষ করেই বোধহয় ভদ্রলোক বললেন, "১৮৫৭-র জিনিস, লখনউতে প্রথম যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল।"

"আপনার কালেকশন?" জিজ্ঞেস করল আকিদা।

"হ্যাঁ, এ বাড়িতে যা কিছু পুরনো জিনিস দেখবে, সব আমারই। এটা আমার হবি।"

অমিতবাবু বললেন, "বাবা, তুমি কথা বলো, আমি এঁদের চায়ের ব্যবস্থাটা দেখি।"

"ওই ছবিটা রেমব্রান্টের নয়?" দেওয়ালে টাঙানো আঁকাটা দেখিয়ে বলল আকিদা।

এই একটা প্রশ্নে ভদ্রলোকের চোখের চাউনিটা পালটে গেল, মনে হল ভদ্রলোক যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এক ঝটকায়।

"ঠিক ধরেছ ভাই, রিটার্ন অব দ্য প্রডিগাল সান। ষোলশো পঁয়ষট্টি সালে আঁকা।"

"ওটাতে যে সইটা আছে, সেটা জাল এবং পরে ধরা পড়েছিল, জানেন তো?" আকিদা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত, "তাই নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার যে এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে, সেটা জেনে ভাল লাগল। এনিওয়ে, যে জন্য এসেছ, সেটা বলি। দ্যাখো ভাই, আমার যে পুরনো জিনিস সংগ্রহের বাতিক আছে সেটা তো বুঝতেই পারছ, এ ছাড়াও একটা ব্যাপার আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, এই প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে আমার উত্থান-পতন জড়িয়ে আছে।"

আকিদা চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে।

"আমার এই বিশ্বাস আমার একমাত্র সম্বল। আমার কালেকশনের কোনও ক্ষতি মানেই এই বিশ্বাসের মূলে আঘাত করা। তাই ব্যাপারটা আমি সহজভাবে নিতে পারছি না কিছুতেই।"

ঘরে একটা থমথমে ভাব।



দেবতার হাত

"চুরি, অথচ চুরি নয়," আপন মনে বললেন শ্যামসুন্দর দেববর্মন, "পুরোটা গেলেও বুঝতাম, কিন্তু এটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

বেশ কষ্ট করেই নিজের ডান হাতটা তুলে দেওয়ালের একটা বিশেষ দিকে পয়েন্ট করলেন ভদ্রলোক।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, যে দেওয়ালে বর্শা টাঙানো ছিলো সেখানেই পারপেন্ডিকুলার অবস্থায় একটা কাঠের র‍্যাক রাখা রয়েছে। সেই তাকে অনেক মূর্তি রাখা রয়েছে। এক চান্সেই চিনতে পারলাম হাতভাঙা ভেনাসের মূর্তিটা। ঠিক পাশেই রয়েছে আরেকটা মার্বেলের মূর্তি, এটারও হাত ভাঙা এবং দুটোর হাইট প্রায় এক, দেড়-দু' ফুট হবে।

"ইংরেজিতে মার্কারি, ল্যাটিনে মারকিউরিয়াস। ইনি রোমানদের ব্যবসা-বাণিজ্যের দেবতা। গ্রিক পুরাণেও এঁর কথা আছে, তবে নাম পালটে হয়ে গেছে হার্মাস। আমি নাম দিয়েছি উড়ন্ত দেবতা।" এক নিশ্বাসে বলে চলেছেন শ্যামসুন্দরবাবু, "এই মূর্তির একটা বিশেষত্ব আছে — মানে ছিল। এর যে ডান হাত, সেটা আগে ভাঙা ছিল না, এর হাতে ছিল একটা ছোট্ট পার্স। এরকম মূর্তি আর পাওয়া যায় না মিঃ দে, অত্যন্ত রেয়ার। বেশির ভাগ মূর্তিতে ডান হাতটা খালি থাকে। কিন্তু এটা অন্যরকম। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমি এই মূর্তি জোগাড় করেছিলাম। ইন ফ্যাক্ট, এই বাড়িটাও কিনি মূর্তিটা কেনার পর। কিন্তু আজ এই হাত আর পার্স মনে হচ্ছে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

খুব মন দিয়ে আকিদা আর আমি মূর্তিটা দেখছিলাম। মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, তার বেশিরভাগটাই একটা টুপি দিয়ে ঢাকা। টুপিতে দুটো পাখির পালক লাগানো, আর সেই পালকের কাজও দেখার মতো। একই পালক লাগানো রয়েছে পায়ের চটিতেও। দেখলেই মনে হয়, আকাশে উড়ছে। বাঁ হাতে একটা লাঠি, তার দু'ধারে মুখোমুখি দুটো সাপ প্যাঁচানো, সবচেয়ে উপরে আরও দুটো পাখির পালক। ডান হাতের কনুইয়ের তলা থেকে কিছু নেই।

অমিতবাবু ঘরে ঢুকলেন চা এবং টা নিয়ে। জিনিসগুলো বয়ে নিয়ে এসেছে আগে দেখা সেই মাফলারওয়ালা মানুষটি। আমার চোখে পড়ল, বয়স্ক লোকটি অদ্ভুতভাবে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

"ব্যাপারটা লক্ষ করলেন কবে?" চায়ে প্রথম চুমুকটা দিয়ে জিজ্ঞেস করল আকিদা।

"কুড়ি তারিখে। আমিই প্রথম দেখি। আগের রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। তখনও হাতটা ঠিকঠাক ছিল, আমি দেখেছি। সকালে দেখি ভেঙে গেছে।"

"তারপর?"

"তারপর অমিকে বলি, কাজের লোকজনকে জিজ্ঞেস করি, তারপর পুলিশে খবর দিই। তাঁরা এসে জেরাটেরা করে জানালেন, মূর্তিটা কারও হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে।" বিরক্ত গলায় বললেন শ্যামসুন্দর দেববর্মন।

"বাড়িতে আর কে কে থাকেন?"

এ বার উত্তর দিলেন অমিতবাবু, "আমি, বাবা ছাড়া আমার ড্রাইভার জগদীশ আর মিশ্রিলাল। ঘর ঝাড়ার জন্য আছে একটা ঠিকে লোক।"

"এরা কি বিশ্বাসী?"

"দ্যাখো ভাই, আজকের দিনে কাকে যে বিশ্বাস করব, আর কাকে করব না, তা ঠিক করতেই সময় লাগে। তবে জগদীশ বছর পাঁচেক কাজ করছে, আর মিশ্রি অমিতের আট বছর বয়স থেকে। ঠিকে লোকটিও কাজ করছে বছরখানেক।"

"ঠিক আগের দিন, উনিশ তারিখে কেউ এসেছিল নাকি আপনার কাছে?"

"নাহ্।"

তাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল আকিদা, আমিও পিছন পিছন হাজির হলাম। ভেনাস আর মার্কারির মূর্তি ছাড়াও রয়েছে লাফিং বুদ্ধ, আধশোয়া গণপতি আর মাইকেল এঞ্জেলোর 'পিয়েটা'। তার পাশেই রয়েছে অদ্ভুত দেখতে একটা কাঠের মূর্তি। মুখটা বেশ হাসি হাসি, মাথায় মন্দিরের চুড়োর মতো টুপি, হাত দুটো বুকের উপর রাখা, থুতনি থেকে ঝুলছে পাকানো দাড়ি। অন্য মূর্তিগুলোর মতো এটাও একটা গোল চাকতির উপর বসানো।

"এটি কে?" জিজ্ঞেস করল আকিদা।

"ওসিরিস, প্রাচীন মিশরীয়দের মতে, মৃত মানুষের দেবতা।"

"আপনার কাজের লোক মন দিয়ে ডাস্টিং করছে না কিন্তু।"

আমি ঝট করে ঘুরে তাকালাম আকিদার দিকে। শ্যামসুন্দরবাবু বসতে যাচ্ছিলেন চেয়ারে, ধপাস করে একটা আওয়াজ পেলাম। অমিতবাবু কাউকে উদ্দেশ্য না করেই "আমি নিজের ঘরে আছি," বলে বেরিয়ে গেলেন।

"ওগুলো আমিই ঝাড়ি," গলায় ঝাঁঝ এবং বিদ্রূপ মিশে রয়েছে, জবাব এল শ্যামসুন্দরের কাছ থেকে। "কাজের লোকের হাতে ছাড়ি না। অনেকদিন অবিশ্যি ঝাড়িনি, আর এ ঘটনার পর তো হাতই দিইনি।"

"আপনার বাড়িতে খুব ধুলো হয়?"

"কলকাতা শহরের কোন বাড়িতে ধুলো হয় না? এই ঘরে তো তাও ধুলো কম, শোয়ার ঘরের জন্য বেঁচে গেছে।"

"শোয়ার ঘরটা একবার দেখা যায়?"

"অবশ্যই।"

আমরা ডানদিকের ঘরটায় গিয়ে ঢুকলাম। এই ঘরে তিনটে খোলা জানলা দিয়ে প্রচুর আলো-বাতাস আসছে। দেখার তেমন কিছু আছে বলে মনে হল না আমার।পূর্বদিকের জানলার পাশে বড় খাট, তার পাশেই পড়ার টেবিল। সেখানে ডাঁই করে রাখা আছে কিছু পত্রপত্রিকা। বইয়ের আলমারি আর একটা স্টিলের আলমারি রয়েছে ঘরের অন্যদিকে।

"অমিতবাবুর ঘরটা দেখা যাবে একবার?"

"কেন নয়? যাও না।"

আবার মূর্তির ঘরে ঢুকে এবার বাঁদিকে গেলাম। অমিতবাবু ঘরেই ছিলেন। দু'-একটা মামুলি কথাবার্তা বলার পর নিজে থেকেই বললেন, "বাবা যাই বলুন না কেন, আমার মনে হয় এটা কমলার কীর্তি। ওরই অসাবধানতায় কোনওভাবে পড়ে গিয়ে মূর্তিটা ভেঙেছে।"

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে ওঁর কথা শোনার পর কথা বলল আকিদা, "আপনি কোথায় আছেন?"

"আমার ব্যবসা আছে, গাড়ির ব্যাটারির। বাবা শুরু করেছিলেন, এখন আমি দেখি। তবে এই কম্পিটিশনের যুগে টিকে থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাবছি ডাইভার্সিফাই করব।"

"তাই?"

"আসলে কী জানেন," একটা সোফায় আয়েস করে বসলেন অমিতবাবু, "বাবা খুব ভেঙে পড়েছেন। এতটাই, যে বাড়িটা ছেড়ে দিতে চাইছেন। ওঁর মতে মূর্তিটা খুব পয়া, এইটা

ভেঙে যাওয়ার পর বাবা খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন।"

"আপনার মা?"

"মারা গেছেন বছরদশেক আগে।"

"অন্য কোনও ভাই-বোন?"

"নাঃ, আই অ্যাম দি ওনলি অফস্প্রিং।"

অমিতবাবুর ঘরটা ওঁর বাবার মতোই। তফাত হল এই ঘরে কোনও বইয়ের আলমারি নেই, আছে একটা টিভি, আর তার পাশেই রংচঙে ছবিওয়ালা একটা তাসের বই।

আবার মুখ খুলল আকিদা, "আপনার অফিস কোথায়?"

"ফোর বি, লিটল রাসেল স্ট্রিটে। আচ্ছা, আপনার কী মনে হচ্ছে বলুন তো? কে করতে পারে কাজটা?"

মুচকি হাসল আকিদা, "এখনও বলার সময় হয়নি।"

ভদ্রলোক বোধহয় এরকম একটা উত্তরের আশা একেবারেই করেননি।

"সেদিন, মানে উনিশ তারিখ রাতে আপনি কোথায় ছিলেন, অমিতবাবু?"

"কোথায় আবার, বাড়িতেই ছিলাম। তবে, ফিরতে রাত হয়েছিল। একটা পার্টি ছিল ক্যালকাটা ক্লাবে। রাত হবে বলেই জগদীশকেও ছুটি দিয়েছিলাম।"

"কিছু আনইউজুয়াল চোখে পড়েছিল আপনার?"

"নাঃ।"

"মূর্তিগুলোর দিকে চোখ যায়নি নিশ্চয়ই?"

"না, জানব কেমন করে কেউ ভেঙে রাখবে?"

"সকালে কিছু চোখে পড়েনি আপনার?"

মাথা নেড়ে না বললেন অমিতবাবু।

"তবে কি জানেন", কিছুক্ষণ ভেবে বললেন অমিতবাবু, "আপনি বলাতে এখন আমার মনে হচ্ছে, সেদিন, মানে কুড়ি তারিখে কমলা বেশ দেরিতে কাজে এসেছিল। তালেগোলে সেটা আর খেয়াল হয়নি।"

"আর?"

"আর...আর", ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক ফাইনালি মাথা নাড়লেন, "নাঃ, নাথিং।"

"ঠিক আছে। আজ উঠি।"

"উঠবেন? বেশ। আমি জগদীশকে বলছি আপনাদের ছেড়ে আসতে।"

ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন অমিতবাবু। ওঁর বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আমরা নীচে নামছি, তখন দেখলাম মিশ্রিলালও দরজার কাছে চলে এসেছে। আমি গাড়ি বারান্দায় নেমে দেখি, আকিদা নেই। কোথায় গেল? এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, মিশ্রিলালের সঙ্গে কথা বলছে।

"জগদীশ" ড্রাইভারকে ডেকে বললেন অমিতবাবু, "তুমি এঁদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এসো, আমি রোজের মতোই এগারটায় বেরোব অফিসে।"

ড্রাইভারটি বেশ অল্পবয়সী। কেন জানি না, দেখলে মনে হয়, কলকাতার ট্রাফিক ভালই সামলাতে পারে।

আকিদাও চলে এল।

"আসুন তা হলে," গাড়ির দরজা খুলে বললেন অমিতবাবু।

ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠে





দেবতার হাত

পড়লাম আমি আর আকিদা। পিছনের সিটে বসে পরপর ভাবার চেষ্টা করছিলাম আজকের ঘটনাগুলো। আকিদা ড্রাইভারের পাশে মাথা নিচু করে বসে।

"উনিশ তারিখ রাতে তুমি কোথায় ছিলে ভাই?" হঠাৎ জিজ্ঞেস করল আকিদা।

"উনিশ... আমি স্যার... সেদিন তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলাম স্যার। ছোটসাহেব নিজেই ছুটি দিয়েছিলেন আমায়।" প্রথম চমকের ভাবটা কেটে যাওয়ার পর গড়গড় করে বলে গেল জগদীশ।

বাড়ি থেকে রাস্তায় গাড়িটা পড়তেই আকিদা জিজ্ঞেস করল, "এটা এখানে কেন?"

"কোনটা স্যার?"

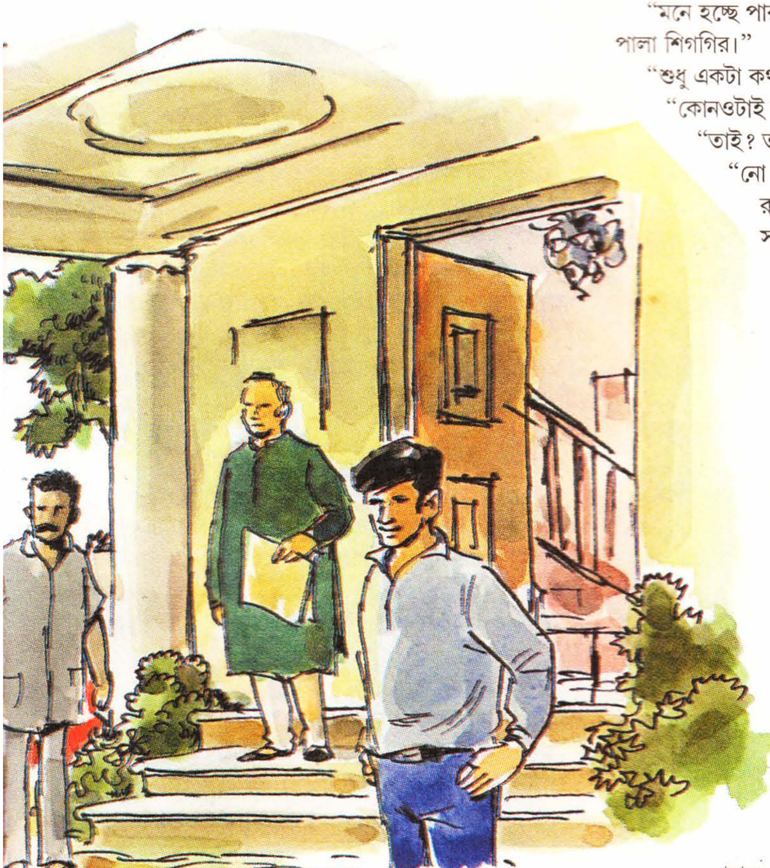
উঁকি মেরে দেখলাম, নিজের পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা জিনিসের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে আকিদা। দেখলে মনে হয় বেশ ভারী, অনেকটা 'দ'-এর মতো দেখতে।

গাড়ির স্পিড কমিয়ে বাঁদিক ঘেঁষে চলল জগদীশ। আর খুব অবাক হয়ে বলল, "তাই বলি, বড় গাড়ির হ্যান্ডেলটা গেল কোথায়?"

"বড় গাড়ি মানে? জাগুয়ার?"

"হ্যাঁ স্যার। স্টার্টই দিতে পারিনি গত তিনদিন। মিশ্রিকে দিয়ে হ্যান্ডেল মারাতে পারিনি বলে গাড়িটা বসেই আছে।"

"এতদিন এখানে পড়ে আছে, আর তোমার চোখে পড়েনি?"



"ছিল না তো, কাল অবধি ছিল না। আমি সিওর।" জগদীশ কনফিডেন্ট।

আবার পিক আপ নিয়েছে লাল মারুতি।

গড়িয়াটের জ্যামে গাড়ি আটকে পড়তেই আকিদা হঠাৎ বলল, "আমাদের এখানেই নামিয়ে দাও জগদীশ।"

অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের বাড়ি তো এখান থেকে বেশ দূরে! যাই হোক, পিছন পিছন আমিও নেমে পড়লাম।

উলটো দিকে আকিদাকে হাঁটতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

"বাড়ি যাবে না?"

"না, ভাবব।"

এ আবার কী? এখন ভাবতে আবার কোথায় যাবে? দেখলাম ক্রসিং-এ দাঁড়িয়ে থাকা একটা ফাঁকা ট্রামে এক লাফে উঠে পড়ল আকিদা। অগত্যা আমিও উঠলাম। ঘড়াং ঘড়াং করে ট্রামটা চলতে আরম্ভ করল রাসবিহারী ধরে।

আমরা বাড়ি ফিরেছি দুপুরের মধ্যেই, তারপর থেকে আকিদাকে দেখে মনে হচ্ছে না কোনও টেনশনে আছে বা কিছু ভাবছে। দিব্যি খাচ্ছেদাচ্ছে, 'দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি' ছবিটার সিডি চালিয়ে দেখছে। আমার কিন্তু চিন্তা হচ্ছে। দু'-একবার খোঁচা মারতে গিয়ে বকুনি খেয়ে ফিরে এসেছি। সন্ধের দিকে ইন্টারনেট খুলে বসল। পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখলাম সাইটটা মাইথোলজির।

সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু ধরতে পারলে?"

"মনে হচ্ছে পারছি। এই, তুই এখনও পড়তে বসিসনি? যা, পালা শিগগির।"

"শুধু একটা কথা বলো, এটা চুরি, না অ্যাকসিডেন্ট?"

"কোনওটাই নয়। জেনে-বুঝে মূর্তিটা ভাঙা হয়েছে।"

"তাই? তা হলে..."

"নো মোর বকবক। যাও, পড়তে যাও।"

রাতে শোয়ার সময় আকিদা বলল, পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর আর একবার বালিগঞ্জ প্লেসে যেতে হবে।

আজও ঢোকার সময় দরজা খুলে দিল মিশ্রিলাল। অবাক হয়ে দেখলাম, আকিদাকে পেল্লায় একটা সেলাম ঠুকল ও।

আকিদাকে দেখে শ্যামসুন্দরবাবু বেশ উত্তেজিত, জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু এগোলে নাকি?"

"বাইরে অমিতবাবুর গাড়িটা দেখলাম না, উনি নেই?"

আকিদার পালটা প্রশ্নে মনে হল ভদ্রলোক ঝিমিয়ে পড়লেন। নিরুৎসাহ গলায় বললেন, "নাঃ, ও রবিবার এই সময় বন্ধুর বাড়ি যায়।"

"আসলে, আপনার কালেকশনের মূর্তিগুলো আর একবার দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।"

"তা দ্যাখো। তবে এসবে আমার ইন্টারেস্ট কমে যাচ্ছে।" খবরের কাগজ তুলে নিলেন ভদ্রলোক।

মূর্তির র‍্যাকটার দিকে এগিয়ে গেল আকিদা। তারপর যেটা

ঘটল, তার জন্য আদৌ তৈরি ছিলাম না আমি। একটা অস্ফুট আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, আকিদার মুখে যন্ত্রণার ছাপ, ওর শরীরটা বেঁকে মাটিতে পড়ছে।

রেগুলার ওয়ার্ক আউট করা আকিদাকে কখনও অসুস্থ হতে দেখিনি। শ্যামসুন্দরবাবুর চিৎকার শুনতে পেলাম, "কী হল? কী করে?"

আকিদা কোনওরকমে বলল, "জল!"

"এসো তো আমার সঙ্গে," বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শ্যামসুন্দরবাবু। ওঁর পিছনে ছুটলাম আমিও। কাল মাঝরাতে একবার ঘুম ভেঙেছিল, তখনও কম্পিউটারের সামনে বসে থাকতে দেখেছি আকিদাকে। কাজের চাপ সামলাতে না পেরেই কি অসুস্থ হয়ে পড়ল?

"কাউকে পাওয়া যায় না এই সময়ে, কাজের লোকগুলো সব হাঁ করে টিভি সিরিয়াল দ্যাখে। বরফ বার করতে পারবে তুমি?" রেফ্রিজারেটরের দরজা খুলে দিয়ে ভদ্রলোক নিজেই গ্লাসে জল ঢালছেন। হ্যাঁচকা টানে আইস ট্রে থেকে দুটো বরফ ভেঙে নিয়ে গ্লাস হাতে ঘরের দিকে ছুটলাম।

কষ্ট করে উঠে বসেছে আকিদা। লক্ষ করলাম, হাঁপাচ্ছে।

"সরি," খুব কষ্ট করে বলল আকিদা, "আসলে আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারিনি..."

ব্যস্তভাবে থামিয়ে দিলেন শ্যামসুন্দর দেববর্মন, "এতে সরি ফিল করার কী আছে? চুপ করে বসো প্লিজ। জলটা খাও। তবে, তোমার ভাই না থাকলে মুশকিলে পড়তাম।"

উঠে দাঁড়াল আকিদা, "আজ আর আপনাকে ডিস্টার্ব করব না, উঠি।"

বুঝতে পারলাম, মক্কেলের বাড়ি এসে অসুস্থ হয়ে পড়ায় রীতিমত খারাপ লাগছে আকিদার।

"এগোবে? জগদীশও নেই যে, বলব তোমাদের একটু এগিয়ে দিতে। যাই হোক, তুমি কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা বন্ধ করে রেস্ট নাও ভাল করে। শরীরটা আগে।"

"কিছু চিন্তা করবেন না, উই ক্যান ম্যানেজ।"

"এখন কেমন লাগছে?" ট্যাক্সিতে উঠে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"ফাইন। শোন বোড়ে, মামা-মাইমাকে কিছু জানাবার দরকার নেই। বুঝলি?"

যদিও পছন্দ হল না কথাটা, কিন্তু ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম।

"তুই কাল কখন স্কুল থেকে ফিরবি রে?"

"অ্যাঁ?" আচমকা প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেলাম। তারপরেই মনে হল, তা হলে কি মিস্ট্রি সল্‌ভ হতে চলেছে?

"তিনটে!" চেঁচিয়ে উঠলাম, "আমার ক্রিকেট প্র্যাকটিস আছে, বাদ দিই কাল?"

"হুম," কিছুক্ষণ ভেবে আকিদা বলল, "নাঃ, সেরেই আয়। তারপর..."

"তারপর কী?"

"তারপর মূর্তি, হ্যান্ডেল, মিশ্রিলালের সেলাম সব মিলিয়ে দেব।" ট্যাক্সির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল আকিদা। খানিক পরে বলল, "আসল রহস্য কিন্তু পালিয়ে বেড়াচ্ছে, মূর্তি চুরিটা উপসর্গমাত্র।"

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।

স্কুলে মন বসছিল না সোমবার — না পড়ায়, না ক্রিকেটে। আজ থেকেই আবার একটা এক্সট্রা প্র্যাকটিস সেশন শুরু হল। হুড়মুড় করে এসেও সাড়ে চারটের আগে ঢুকতে পারলাম না বাড়িতে।

ঢুকেই ধমক।

"লেট করিস কেন? চটপট কর, সাড়ে পাঁচটায় বালিগঞ্জ প্লেসে পৌঁছতে হবে আমাদের।"

তৈরি হতে আমার পনেরো মিনিট লাগল। কেন যাচ্ছি জানি না, সমাধানের কতদূর, সে সম্পর্কেও কোনও আইডিয়া নেই। আকিদার মাথা ঘুরে যাওয়ার পর থেকে আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহসও পাচ্ছি না।

আকিদা বারবার ঘড়ি দেখছে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটা বাজে, এত ঘড়ি দেখার কারণ বুঝতে পারছি না। বেশ শীত শীত করছে। আজ সন্ধে নেমেছে তাড়াতাড়ি, গরম জামা পরেও আসিনি। আজ গাড়ি বারান্দায় লাল মারুতি আছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখলাম, মিশ্রির সঙ্গে কথা বলছে আকিদা।

শ্যামসুন্দরবাবু আমাদের দেখে ম্লান হাসলেন। আবার ঘড়ি দেখল আকিদা। পাশের ঘর থেকে আমাদের আওয়াজ পেয়ে অমিতবাবু এলেন এ ঘরে।

"ব্যাপার কী?"

অমিতবাবুর গলায় ঠাট্টার সুরটা খট করে আমার কানে লাগল।

"তা, এগোলেন নাকি কিছু ভেবেটেবে?"

"আজ কেমন আছ ভাই?"

দুটো প্রশ্ন একসঙ্গে এল। আকিদা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটাই আগে দিল, শ্যামসুন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাল।"

"তারপর?" বেশ মেজাজ নিয়েই বললেন অমিতবাবু, "ভাঙা হাতটা পেলেন নাকি?"

আকিদার জবাবটাও এল বুলেটের মতো, ছোট্ট করে বলল, "হ্যাঁ, এই তো, এই যে।"

তাকিয়ে দেখলাম ওর ডান হাতে মার্কারির ভাঙা অংশ, তাতে একটা ছোট্ট পার্স।

অমিতবাবুর অবস্থাটা যে ঠিক কেমন সেটা লিখে বোঝানো অসম্ভব। উনি প্রশ্নটা করে বেশ একটা কিস্তিমাতের ভাব নিয়ে বসতে যাচ্ছিলেন চেয়ারে, কিন্তু বসা আর হল না, দাঁড়িয়েই রইলেন। শ্যামসুন্দরবাবু উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য, বাবা-ছেলে দু'জনেই নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

"চেনেন তো?" আকিদার গলা থমথমে পরিবেশটাকে ভাঙার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

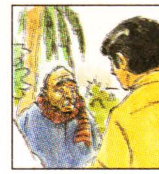
হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পাওয়ার অনাবিল আনন্দ দেখতে পাচ্ছিলাম শ্যামসুন্দরবাবুর চোখে-মুখে। অমিতবাবুর মুখে অবাক হওয়ার সঙ্গে মিশে আছে বোকা বনে যাওয়ার ভাব।

আকিদা মার্কারির মূর্তির দিকে এগিয়ে গেল। ভাঙা অংশটা দিব্যি বসে গেল মার্কারির হাতে।

"ফেভিকল দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন," বলল আকিদা, "চান্স আছে লেগে যাওয়ার।"

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। ম্যাজিক হল নাকি?

ঘরের নিস্তব্ধ ভাবটা কেটে গেছে। সকলে একসঙ্গে কথা বলছেন। শ্যামসুন্দরবাবু জিজ্ঞেস করছেন, "তুমি পেলে কী করে এটা?" অমিতবাবু আস্ফালন করছেন, "হাতটা কে দিল আপনাকে? বলুন নামটা, এখনি ধরব তাকে গিয়ে।"



দেবতার হাত

আকিদা কিছু বলার আগেই সিঁড়ি দিয়ে কারও উঠে আসার শব্দ পাওয়া গেল। যিনি উপরে উঠছেন তাঁর যে বেশ অসুবিধে হচ্ছে উঠতে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই বুঝলাম, আমি ঠিকই আন্দাজ করেছি। যিনি ঘরে ঢুকলেন, তিনি বিশাল ভুঁড়িওয়ালা এক অবাঙালি, তাঁর মাথাজোড়া টাক এবং মুখে বিজয়ীর হাসি।

"দেখো আমিত, তুমনে বুলায়া ঔর হম চলে আয়ে — হা হা হা।"

হিন্দি গানের সুরের নকল করে বেসুরো একটা গলা — যাঁকে বলা তিনি হাসা তো দূরের কথা, কথা বলার অবস্থাতেও নেই। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন আগন্তুকের দিকে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে অমিতবাবু বললেন, "তুমি এখানে?"

"কিঁউ?" ভুরু উঁচিয়ে বললেন আগন্তুক, "তুমার নতুন সেক্রেটারি হামকো ফোন করকে বোলা কি তুমি আমার সাথে সাড়ে পাঁচ বাজে মিট কোরবে। ইসি লিয়ে হম আ গয়ে।"

"আমার নতুন সেক্রেটারি!" আকাশ থেকে পড়লেন অমিতবাবু।

"আমি বলছি," গম্ভীর গলায় বলল আকিদা। ও এখনও মার্কারির মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে, চোখ শ্যামসুন্দরবাবুর দিকে।

তাঁকে বলল, "আপনি কি জানেন, রমেশ কারনানির সঙ্গে প্রোমোটিং-এর ব্যবসায় নেমেছেন অমিতবাবু?"

"কই না তো! জানি না।"

আকিদা কিছু বলার আগেই খুব অবাক হয়ে রমেশ কারনানি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমনে পিতাজিকো কুছ বতায়া নেহি? তাজ্জব কী বাত!"

"আজ সকাল দশটা নাগাদ রমেশবাবুর অফিসে গিয়েছিলাম আমি। ওনার সঙ্গে আলাদা বসে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলাম আমি। তা ছাড়া মোটিভটা না জানলে অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না।"

"মানে? কী ভেবেছ তুমি?" এক ধাক্কায় আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলেন অমিতবাবু, "আমাকে অপরাধী বানাচ্ছ? সাহস তো কম নয় তোমার?"

অমিতবাবুকে অগ্রাহ্য করে বলে চলল আকিদা, "গিয়ে দেখি উনি আসেননি। তবে, রমেশজি অপেক্ষা করছেন ওঁর জন্য। সুযোগটাকে কাজে লাগালাম আমি। পরিচয় দিলাম অমিতবাবুর নতুন সেক্রেটারি হিসেবে, এবং জানতে পারলাম যে..."

"যে কী?" শ্যামসুন্দরবাবুর গলা ব্যগ্র।

"রমেশজী আপনিই বলুন, অমিতবাবু কী বলেছিলেন আপনাকে?"

"আমিত কহিয়েছিল কি যে, বাড়ি ভাঙার বেপারে উসকা লাস্ট অবস্টিকল, মানে বাধা — ইয়ানে কি উহার বাবাকে উ রাজি করিয়ে আনিয়েসে। হামি তো ফাইনাল টক করার জন্য আসিয়েছি। ফাদার কে ওয়াস্তে সহি করার কাগজ ভি আছে হমার কাছে।" গর্বের সঙ্গে শেষ করলেন রমেশ কারনানি। ঘরে সবাই চুপ।

"বাকিটা আমি বলি। অমিতবাবুর ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না কিছুদিন ধরে।"

"ওর চিরকালই কোনও দিকে মন নেই," আক্ষেপের সুর স্পষ্ট শ্যামসুন্দরবাবুর গলায়।

আবার শুরু করল আকিদা, "উনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে ডাইভার্সিফাই করতে চান, তবে কোন ফিল্ডে, সেটা বলেননি। এত বড় বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট বানাতে পারলে দু পয়সা আসত ঠিকই, কিন্তু বাধ সাধলেন ওঁর বাবা। কিন্তু তিনি কিছুতেই এ বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হলেন না। অমিতবাবু জানতেন যে মার্কারির মূর্তির সঙ্গে বাড়িটার ভাল-মন্দের যোগ আছে বলে মনে করেন ওঁর বাবা। এই অ্যাকিলিস হিলেই তাই আঘাতটা করলেন। উনিশ তারিখ রাতে ক্লাব থেকে ফিরে জাগুয়ারের হ্যান্ডেল দিয়ে..."

"টোটাল কক অ্যান্ড বুল স্টোরি। আগাগোড়া মিথ্যে। প্রমাণ করতে পারবে কিছু?" চেঁচিয়ে উঠলেন অমিতবাবু।

"আমাদের জন্য চা আনার নাম করে সেদিন আপনি কোথায় গিয়েছিলেন বলবেন কি?" বরফের মতো ঠাণ্ডা আকিদার গলা। "বোধহয় জানতেন না যে, আমাদের উপস্থিতি আপনার কাছে এতটা পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে, তাই না? তাই নিজের ঘর থেকে জাগুয়ারের হ্যান্ডেলটা বার করে আর কোনও জায়গা না পেয়ে লুকিয়ে রাখলেন মারুতিতে, ভাবলেন আমার চোখে পড়বে না? আসলে আপনার উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুটো পাখি মারা, বাড়িটা ভাঙবেন আর গাড়িটাকে বিদায় করবেন। বেশ কয়েকদিন স্টার্ট না নিলেই গাড়িটা অকেজো হয়ে যাবে, তাই হ্যান্ডেলটা সরিয়ে রাখাই যথেষ্ট। কিন্তু..."

"আবার মিথ্যে বলছ তুমি! তোমাকে আমি..."

"মিশ্রিলাল," আকিদা যে এত উঁচু গলায় কথা বলতে পারে, আমি জানতাম না। রমেশজিকেও দেখলাম আকিদার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন।

মাফলার জড়ানো মিশ্রিলাল এসে ঢুকল ঘরে।

"সেদিন অমিতবাবু আমাদের জন্য চা করতে বলেছিলেন তোমাকে?" প্রশ্ন করল আকিদা।

"নেহি সাব, ম্যায়নে খুদ বনায়া", জবাব দিল মিশ্রিলাল।

"আর উনিশ তারিখ রাতে তুমি কী শুনেছিলে বলবে আমাদের?"

"হামি কুছু তোড়বার আওয়াজ শুনেছিলাম সাব। ফির ম্যায়নে দেখা কে বহুত দের তক ছোটবাবুর রুমমে বাত্তি জ্বলছিল।"

"কুড়ি তারিখে কমলা সময়মতো কাজে এসেছিল?"

"জরুর সাব।"

"নির্দোষ কমলার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছিলেন আপনি।" আকিদা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে রয়েছে অমিতবাবুর দিকে।

থপ করে একটা আওয়াজ, রমেশ কারনানি বসে পড়েছেন।

"তুমি এসো মিশ্রিলাল।" মিশ্রি আর এক দফা সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রমেশজির দিকে ফিরল আকিদা। নরম গলায় বলল, "আপনি কি বুঝতে পারছেন যে, এই বাড়িটা ভাঙলে মার্কেটে আপনার গুডউইল নষ্ট হবে? আপনি কি সেটা চান?"

একটা কথাতেই খচমচ করে উঠে দাঁড়ালেন রমেশ কারনানি।

"আরে নেহি, নেহি। এক মকানকে লিয়ে মার্কেটমে কৌন আপনা নাম ডুবায়গা ভাই? হামি তোবে..."

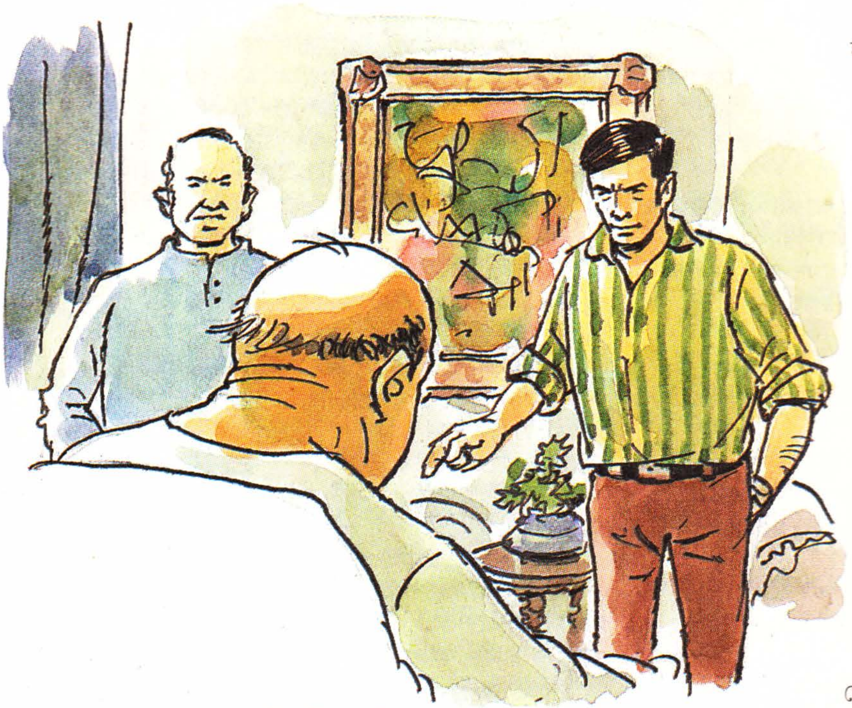
"হ্যাঁ, আসুন।" গৃহকর্তারা কিছু বলবার মতো অবস্থায় ছিলেন না বলে আকিদাই বিদায় দিল রমেশ কারনানিকে।

"অমিত কোথায় রেখেছিল ওটা?" বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুললেন শ্যামসুন্দরবাবু।

"ইচ্ছে করলেই ওটা ফেলে দিতে পারতেন অমিতবাবু,

তাতে অনেক ঝামেলাও এড়ানো যেত। কিন্তু আপনার ছেলেও বিশ্বাস করেন আপনার মতে। বাড়িটার ভাল মন্দের সঙ্গে মার্কারির মূর্তিটাকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন উনি নিজেও। তাই, ভাঙা হাতটা না ফেলে ওসিরিসের মূর্তির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন ওটা। ওসিরিস সম্পর্কিত প্রবাদ বলে, মৃত মানুষের মধ্যেও প্রাণসঞ্চার করতে পারেন এই দেবতা। আমার ধারণা, এই জমিতে নতুন বাড়ি তৈরি হওয়ার পর আবার মার্কারির হাত উনি নিজেই জোড়া লাগিয়ে দিতেন। উনি জানতেন, ওসিরিসের মূর্তিটা খোলা যায়।"

শ্যামসুন্দরবাবু যেন ঘুম থেকে উঠলেন, "আমিই বলেছিলাম। লন্ডন থেকে ওটা কেনার সময় মেমসাহেব দোকানদার আমায়



দেখিয়েছিল, অমিতকে বলেছিলাম বটে, তবে আমার মনে ছিল না।"

"মারকিউরাস কিন্তু রোমানদের চোরের দেবতা। এটা জানলে বোধহয় অমিতবাবু এতটা ঝুঁকি নিতেন না!" আকিদার কথা মোটামুটি শেষ বলে মনে হল।

"তোমার যে এরকম অবনতি হবে, আমি ভাবিনি অমিত। ছিঃ!"

"বিশ্বাস করো বাবা, আমার মাথার ঠিক ছিল না।"

আমার হাতে আলতো টান মারল আকিদা, "চল, আর এখানে দাঁড়ানো ঠিক নয়।"

"উফ! তুমি কেমন করে ধরলে বলো তো?"

"বললেই বলবি 'সিম্পল, এ তো আমিও পারতাম!'"

"বলি তো বলব, তুমি বলোই না?"

"মূর্তিগুলোর পাশে ধুলো পড়েছিল দেখেছিলি? সেটার উপরে পড়া ছাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কেউ মার্কারি আর ওসিরিসের মূর্তি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। মূর্তিগুলো দেখার সময় ওসিরিসের মূর্তিটা তুলেছিলাম একবার। তখনই লক্ষ করেছিলাম, ওই সাইজের কাঠের মূর্তির তুলনায় ওটা বেশ ভারী।"

"অমিতবাবুর দিকে তীরটা ঘোরালে কখন?"

"প্রথম সন্দেহটা হয়েছিল ট্যারট্‌সের বইটা দেখে।"

"ট্যারট্‌স কী?"

"তাসের তুকতাক। ওনার ঘরে একটা বই দেখিসনি তাসের?"

"হ্যাঁ, ছিল তো টিভির পাশে।"

"যার ঘরে অন্য কোনও বই নেই, তার ঘরে যদি তাসের ম্যাজিকের বই থাকে, সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তারপর মিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলেই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হল।"

"ভাঙা অংশটা পেলে কেমন করে?"

"অভিনয়টা খারাপ করি না তা হলে? কি বলিস?"

কয়েক সেকেন্ড লাগল বুঝতে।

"তার মানে সেদিন তুমি অসুস্থ হওনি?"

"আদৌ না। তোরা ঘর থেকে বেরোনো মাত্রই ওসিরিসের মূর্তির প্যাঁচ খুলে ভাঙা অংশটা পকেটে পুরে ফেলি। আসল কাজটা তো অমিতবাবুই করে রেখেছিলেন। না হলে কি আর সহজে খুলত অত পুরনো প্যাঁচ? গতকালই গোটা ব্যাপারটা মিটে যেত বুঝলি? আমি চেয়েছিলাম ওঁকে জেরা করেই সব কিছু বার করতে, তাই অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে রমেশ কারনানিকে পেয়ে যাওয়ায় আরও অনেকগুলো জট খুলে গেল।"

"আচ্ছা, উনি তা হলে নিজেই তোমাকে ডেকে পাঠালেন কেন?"

"বাবাকে তো দেখাতে হবে যে ছেলে কিছু করছে। তা ছাড়া ফাঁপা সৌজন্যের একটা দাম আছে তো?"

ভেবে দেখলাম যে, সত্যিই পুরো ঘটনাটা ঘটতে দেখেছি চোখের সামনে, তবে প্রপার পারসপেক্টিভ অনুসারে সাজাতে পারিনি। একটা কথা ভেবে মনটা খচখচ করছিল। দোনামনা করে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম।

"আচ্ছা, তোমাকে তো শ্যামসুন্দরবাবু কিছু দিলেন টিলেন না?"

"মানে?"

"মানে রিওয়ার্ড-টিওয়ার্ড আর কি?"

খুব নিচু গলায় আকিদা বলল, "সব সময় মেটিরিয়াল রিওয়ার্ড দিয়ে কিছু হয় না রে। আসল ব্যাপারটা হল মনের শান্তি। বড় হ', তারপর বুঝবি।"

বালিগঞ্জ প্লেস ইস্টের উপর দিয়ে যখন যাই, বেশ লাগে। পাশের দুটো বাড়ি ভেঙে মাল্টিস্টোরিড হচ্ছে। কিন্তু শ্যামসুন্দরবাবুর বাড়িটা আজও একইরকম আছে।

ছবি: দেবাশিস দেব



ডেড সি-র জল দিয়ে তৈরি হয়েছে জাপানের এই অ্যাকোয়া অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। মানুষ চাইলেও ডুবতে পারবে না এখানে

ডুবে যাওয়ার উপায় নেই

সাঁতার না জানলেও মানুষ অনায়াসে ভেসে থাকবে এই হ্রদে। আসলে হ্রদ হলেও এর নাম 'ডেড সি'। লিখেছেন বেদদ্যুতি চক্রবর্তী

সমুদ্রের নোনা জলে স্নান করলে সারা শরীরটাই কেমন নোনতা হয়ে যায়। অনেকে আবার সমুদ্রস্নানের পর ঘরে এসে 'ভাল' জলে না নাইলে শান্তি পান না। কোষ ও দেহতরলেও (রক্ত, লসিকা ইত্যাদি) নির্দিষ্ট মাত্রায় নুন আছে। সেই ঘনত্বেরও বেশি নোনা দ্রবণে যদি কোষকে রাখা যায় তবে কোষ থেকে জল বাইরে বেরিয়ে দু'দিকের ঘনত্বকে সমান করতে চাইবে। এটাই অভিস্রবণ-বিজ্ঞানের নিয়ম। আশপাশের জল যত বেশি নোনা, কোষ থেকেও তত বেশি জল বাইরে বেরোবে। জলের অভাবে এভাবেই একসময় কোষের মৃত্যু ঘটে। পুকুরের মিঠে জলের মাছ এই কারণেই সমুদ্রের জলে বেশিক্ষণ বাঁচে না।

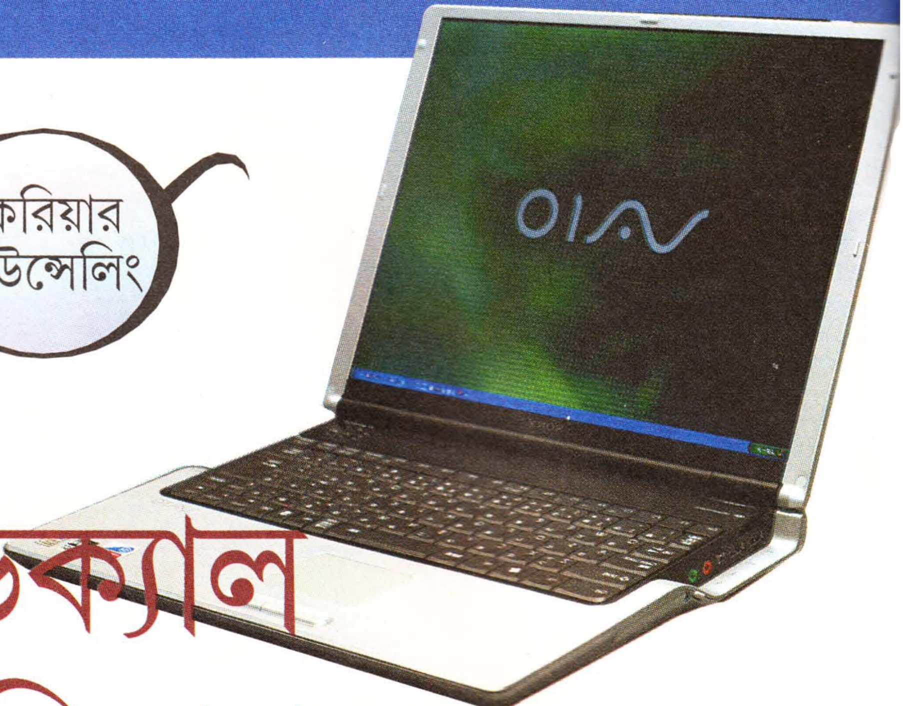
তবে, সামুদ্রিক প্রাণীর এতে অসুবিধে নেই। সমুদ্রে থাকতে থাকতে ব্যাপারটা ওদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ সমুদ্রের তুলনায় ছ'গুণ বেশি নোনা জলে যদি সামুদ্রিক প্রাণীদের ছেড়ে দেওয়া হয়? অবশ্যই তারা মরবে। পৃথিবীতে সত্যি-সত্যি এমনই একটা 'মৃত্যু-সাগর' বা 'ডেড সি' রয়েছে ইজরায়েল আর জর্ডন দেশের মাঝামাঝি জায়গায়। প্রায় ৭৬ কিলোমিটার লম্বা আর গড়ে ১০ থেকে ১৬ কিলোমিটার চওড়া ওই ভীষণ নুনের সমুদ্রে কোনও প্রাণী নেই। অসম্ভব সংগ্রাম করে শুধু বেঁচেবর্তে আছে সামান্য কিছু অনুবীক্ষণিক জীব। আসলে 'মৃত্যু-সাগর' একটা বড়সড় হ্রদ। এখানে জল ঢুকলে (জর্ডন নদী এই হ্রদে মিশেছে) আর বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা নেই। মরু আবহাওয়ায় প্রতিনিয়ত সূর্যের তেজে বাষ্পীভূত হয়ে চলেছে 'মৃত্যু-সাগরের' জল, 'প্রাণের বন্ধু' নুনকে হ্রদের বাকি জলে ফেলে রেখে। এভাবেই মৃত্যু-সাগরে লবণের ঘনত্ব বেড়ে চলেছে। সাঁতার না জানলেও মানুষ অনায়াসে ভেসে থাকবে ওই হ্রদে। কারণ আর্কিমিডিস বলেছেন, নিমজ্জমান বস্তুটি যতখানি তরল অপসারণ করবে, তার ওজন যদি বস্তুটির চেয়ে বেশি হয় তবে তাকে ভাসতেই হবে। সাধারণ সমুদ্রের চেয়ে ছ'গুণ বেশি লবণ থাকায় স্বভাবতই সেই জল যথেষ্ট ভারী।

কিন্তু, এমন হ্রদের নাম মৃত্যু-সাগর হলেও এখান থেকেই মানুষ নিত্যদিন সংগ্রহ করে চলেছে বেঁচে থাকার রসদ। পটাশিয়াম, সোডিয়াম, জিপসাম, ব্রোমিন, ক্যালসিয়াম, আরও কত কী।

বুদ্ধি থাকলে শত্রুর কাছ থেকেও কেমন কাজ আদায় করা যায়!

ফোটো: এ এফ পি





মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন এবং মাল্টিমিডিয়া কোর্স

আমি একাদশ শ্রেণীতে পড়ি, কলা বিভাগে। প্রথাগত কেরিয়ারের প্রতি আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে আমি উৎসাহী। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানালে ভাল হয়। মাল্টিমিডিয়া নিয়ে কেরিয়ার তৈরি করতে চাই।

শ্রাবণী দে
মল্লারপুর, বীরভূম

প্রথাগত পেশার বাইরে তোমার ঝোঁক জেনে খুশি। মাধ্যমিক পাশ করার পরেই তুমি মাল্টিমিডিয়া কোর্স শিখতে পারো। এর পাঁচটি বিভাগ। অডিও, ভিশুয়াল, ইন্টার অ্যাকটিভিটি, অ্যানিমেশন ইত্যাদি। যার মধ্যে কিছুটা ক্রিয়েটিভিটি আছে এবং ডিজাইন বা কালার সেন্স আছে সেই ভালভাবে মাল্টিমিডিয়া শিখতে পারবে। কলকাতায় বেশ কয়েকটি কলেজে মাল্টিমিডিয়া কোর্স শেখানো হয়। যেমন— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জেড কেরিয়ার অ্যাকাডেমি মাল্টিমিডিয়া কোর্সের ট্রেনিং দিচ্ছে। তা ছাড়া জেড অ্যাকাডেমির পার্ক স্ট্রিট, গোল পার্ক ইত্যাদি শাখায়ও মাল্টিমিডিয়া কোর্স শেখানো হয়।

মাল্টিমিডিয়া কোর্সে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অ্যারেনা মাল্টিমিডিয়া খুবই নাম করেছে। কলকাতার গোল পার্কে এবং আরও কয়েকটি জায়গায় এরা কোর্স করায়। মোটামুটিভাবে ছ' মাসের কোর্সের জন্য লাগে ১৬,০০০ থেকে ১৯,০০০ টাকার মতো। তুলনামূলকভাবে জেড কেরিয়ার অ্যাকাডেমির কোর্স ফি কম, ১০,০০০-১২,০০০ টাকার মধ্যে। স্টার মাল্টিমিডিয়া সংস্থাও কলকাতায় মাল্টিমিডিয়া কোর্স করায়।

মাল্টিমিডিয়ায় দক্ষ হলে অ্যাড এজেন্সি, সংবাদপত্র বা কর্পোরেট অফিস, প্রিন্টমিডিয়া, ফিল্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পাওয়া যায়। স্বনিযুক্তি প্রকল্পেও কাজে লাগে মাল্টিমিডিয়ার দক্ষতা।

আমি পুনের একটি কলেজে পড়ি। মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

অরিজিৎ মণ্ডল
(ই-মেল মারফত)

ভারতের বেশ কয়েকটি সংস্থা কিছু মার্কিন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই পেশায় ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছে। প্রার্থীর প্রখর শ্রবণশক্তি এবং ইংরেজিতে দখল থাকা দরকার। শ্রবণশক্তি প্রখর না হলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মেসেজ শুনে ট্রানস্লেট করা সহজ হবে না। মার্কিন মুলুকে ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞরা রোগ সম্পর্কে তাঁদের পর্যবেক্ষণ বলে যাচ্ছেন, আর

সেই বক্তব্য ডিক্টাফোনের মাধ্যমে মার্কিন সংস্থার তত্ত্বাবধানে ইন্টারনেটে চলে আসছে তোমার কাছে। সেই পর্যবেক্ষণ শুনে গুছিয়ে বিশদভাবে লিখে দিতে হবে। এর পর সেই মেসেজ আবার ফিরে যাবে মার্কিন মুলুকের এই সংস্থায়। এই মেডিক্যাল প্রেসক্রিপশন করার কাজটাই শ্রুতিমাধ্যমে লিখিত হয়ে পরিবেশিত হচ্ছে বলেই এটি মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন।

কলকাতায় এক সময় অনেক সংস্থায় এ-বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। উল্লেখযোগ্য সংস্থা—নিউ আলিপুরের গুপ্ত নিকেতনে ইনফোভিশন, বালিগঞ্জের পূর্ণ দাস রোডের মেডিট্রান্স, সল্ট লেক বি ডি অঞ্চলের অপ্টিমাল কম্পিউটিং সেন্টার বা মেডিস্ক্রাইব সংস্থা। এ ছাড়া সল্ট লেকের ট্রান্সটেক, কে এম টি ইত্যাদি সংস্থাও আছে। আলিপুরের বেলভেডিয়ারের স্টেসেলিট সংস্থার প্রশিক্ষণও ভাল। এদের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডেও শাখা আছে। বেশিরভাগ কেন্দ্রেই ছ' মাসের কোর্স করানো হয়। কোর্স ফি ২২,০০০-২৫,০০০ টাকার মধ্যে। ছ' মাস প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সংস্থা শিক্ষার্থীকে অন দ্য জব ট্রেনিং দেয়। যেসব ছাত্রছাত্রী কলকাতায় মেডিক্যাল প্রেসক্রিপশনে প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা আশাপ্রদ নয়। তুলনামূলকভাবে চেন্নাই/দিল্লির শিক্ষার্থীরা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজের সুযোগ অনেক বেশি পাচ্ছে। সর্বভারতীয় কয়েকটি কেন্দ্রের নাম—

১. অ্যাকাডেমি অফ মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন
সি ৫/৩২, সফদরজং ডেভেলপমেন্ট এরিয়া, (অপোজিট আই আই টি মেন গেট)
নয়া দিল্লি-১১০ ০১৬
ফ্যাক্স-২৬৮৬-৭৫৩৬,
ই-মেল-shyama @ del2. vsnl. net. in

এখানে পাঁচ মাসের কোর্স করানো হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ অথবা স্নাতক হতে হবে। ইংরেজি ভালভাবে লিখতে ও বলতে পারা চাই।

২. বাজাজ ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি
ইউনিট নং-১, ফার্স্ট ফ্লোর, সি-৪ ই মার্কেট, জনকপুরী
নয়া দিল্লি-১১০ ০৫৮
ই-মেল-jsr @ bol. net. in, bimt_2000 @ yahoo. co. uk

চার মাসের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। ইংরেজিতে ভাল দখল থাকা চাই। শিক্ষাগত যোগ্যতা ১০+২ পাশ। বিজ্ঞান বিভাগ হলে ভাল হয়।

৩. গুড উইল স্কুল অফ মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন
চাতালা টাওয়ার্স
১৯ অ্যাভিনিউ রোড, নাঙ্গামবাক্কাম,
চেন্নাই-৬০০ ০৩৪
ফোন- ২৮২১-২০৭৪/২০৭৫
ফ্যাক্স-২৮২৭-৪৮১৪

এখানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর কিংবা মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন ডিপ্লোমাধারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

৪. ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপসন
এইচ-১৫, সাউথ এক্সটেনশন, পার্ট-১
নয়া দিল্লি-১১০ ০৪৯
ই-মেল-info @ iimt. org, website.iimt. org

৫. এম ডি এস ইনফোটেক লিঃ
বি-২১৯, সরস্বতী বিহার, পিতামপুরা
নয়া দিল্লি-১১০ ০৩৪

ভর্তির খবর

ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এ সামার কোর্স

ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, পুনে-৪ পরিচালনা করছে ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এ সামার কোর্স। চলবে ১৯ মে ২০০৩ থেকে ১৪ জুন ২০০৩ পর্যন্ত। এটি ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া এবং ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার একটি যৌথ প্রয়াস। পড়ানো হবে ইংরেজি মাধ্যমে। প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১ জুলাই ২০০২ তারিখের হিসেবে ন্যূনতম ১৮ বছর। কোর্স ফি ৫০০০ টাকা। এই কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারে ফিল্ম স্টাডিজের শিক্ষক থেকে শুরু করে ফিল্ম সোসাইটি অর্গানাইজার, ফিল্ম ক্রিটিক, জার্নালিস্ট, ফিল্ম রিসার্চার, ফিল্ম সংক্রান্ত কাজে দায়িত্ববান ব্যক্তি কিংবা ফিল্ম স্টাডিজে আগ্রহী যে-কোনও শিক্ষার্থী। হস্টেলের সুযোগ আছে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট প্রোফর্মায়। আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে ২০০ টাকার ক্রস্ড ডিমান্ড ড্রাফট এবং পাঁচ টাকার ডাকটিকিটযুক্ত নাম-ঠিকানা লেখা খাম। ড্রাফট কিনতে হবে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, এন এফ এ আই, পুনে'-র অনুকূলে। আবেদনের ফরম্যাট-এর জন্য দেখে নেওয়া যেতে পারে ২৭ মার্চ ২০০৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার ভর্তির বিজ্ঞপ্তি। আবেদনপত্র পাঠানোর শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল ২০০৩।



চলছে ফিল্মের কারিগরি শিক্ষার ক্লাস
ফোটো: দেশকল্যাণ চৌধুরী

ভর্তির খবর

সার্টিফিকেট কোর্স ইন প্রোডাকশন টেকনোলজি

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি, ব্লক-এল এ, প্লট-৩ বি, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯৮ পরিচালনা করছে 'সার্টিফিকেট কোর্স ইন প্রোডাকশন টেকনোলজি'। কোর্সের মেয়াদ এক বছর। শুরু হবে এপ্রিল ২০০৩ থেকে। ১০+২ পর্যায়ের প্রার্থীরা অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক প্রার্থীরাই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে।



ফ্যাশন টেকনোলজির ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা
ফোটো: তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম সেমিস্টারে শেখানো হবে— ফান্ডামেন্টাল্‌স অফ অ্যাপারেল প্রোডাকশন, বেসিক্‌স অফ গার্মেন্ট কনস্ট্রাকশন, বেসিক প্যাটার্ন মেকিং অ্যান্ড গ্রেডিং, টেক্সটাইল সায়েন্স, ইকুইপমেন্ট টেকনোলজি। দ্বিতীয় সেমিস্টারে শেখানো হবে— অ্যাডভান্স গার্মেন্ট কনস্ট্রাকশন, অ্যাডভান্স প্যাটার্ন মেকিং অ্যান্ড গ্রেডিং, কাটিং রুম প্রসিডিওর, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কস্টিং, ফেব্রিক ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং, গার্মেন্ট প্রোডাকশন কন্ট্রোল, কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স, কম্পিউটার এডেড ডিজাইন ইত্যাদি। কোর্স ফি: ৫০,০০০ টাকা। ভর্তির সময় দিতে হবে অর্ধেক টাকা। আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করতে পারেন প্রোগ্রাম কো অর্ডিনেটর-এর সঙ্গে।

তোমার কি লেখাপড়া বা কেরিয়ার সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন আছে? নাম ও পুরো ঠিকানা লিখে চিঠি পাঠাও আমাদের দফতরে। ই-মেলও করতে পারো। ঠিকানা : anandamela @abpmail.com

ই-মেল-mds @ ndt. vsnl. net. in

এখানে মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশনে পাঁচ মাসের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়। ইংরেজিতে দক্ষ স্নাতক/উচ্চ মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীদের ভর্তি করা হয়।

৬. মেডিট্রান্স ইন্ডিয়া
২৯/১ অশোকনগর, জেল রোড, তিলকনগর সার্কেল
নয়া দিল্লি-১১০ ০১৮
ফোন-২৫৪০-৮৬৩৮

এখানে ডাক্তার, গৃহবধূ, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, স্নাতক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, সব স্তরের শিক্ষার্থীদের মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

৭. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন
গ্লোব হাউস (অপোজিট ডি ৬০/২),
ইস্ট অফ কৈলাস,
নয়া দিল্লি-১১০ ০৬৫

এদের অন্যত্রও শাখা আছে। এখানে চার/পাঁচ মাসের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়।

৮. প্যান-আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন
সেকেন্ড ফ্লোর, ৪৮ লাজপতনগর-৩, রিং রোড
নয়া দিল্লি-১১০ ০২৪
ফ্যাক্স-২৬৩২-৫৬৫৬
www. panamericaninstitute. com

এখানে চার মাসের ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয়।

৯. শিবম ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন
ডি ৫৩, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১,
নয়া দিল্লি-১১০ ০২০
ফ্যাক্স- ২৬৮১-৩৬৪৫
ই-মেল-s. i. m. t. @ usa. net, website www. vocalscribe. com

এখানে পাঁচ মাসের কোর্স করানো হয়। স্নাতক/উচ্চ মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা ভর্তি হতে পারে।

১০. সাইটেক
১৪৪/১, এন এইচ রোড
চেন্নাই-৬০০ ০৩৪
ই-মেল-sitech @ vsnl. com

এখানে মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করানো হয়। যে-কোনও শাখার স্নাতক ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে। ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় মার্চ মাস নাগাদ।

মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন শিখে ব্যবসায় আগ্রহী প্রার্থীরা বিভিন্ন ব্যবসায়িক তথ্য ও টেকনিক্যাল ডিটেলস পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে—

ডিরেক্টর,
ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনিক্যাল কনসালটেন্সি অর্গানাইজেশন অফ তামিলনাড়ু লিঃ
৫০-এ, গ্রিমস রোড
চেন্নাই-৬০০ ৬০৬
ফ্যাক্স-০৪৪-২৮২৩-১৯৮৭
ই-মেল-itcot @ vsnl. com, website www. itcot. com

পরামর্শ/সহায়তার জন্য পাঁচ হাজার টাকার মতো সার্ভিস চার্জ লাগে। ইন্টারনেটেও জেনে নেওয়া যেতে পারে— www.tn.gov/.in www. chennaionline. com/www. aaraamthinal. com/www. southindia. com .

উত্তর দিচ্ছেন অমর দাশ



পশুরা যখন সেলিব্রিটি

নিপারের মৃত্যুর পর এইচ এম ভি রেকর্ড কোম্পানি বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করত নিপারের মতোই দেখতে মেগ নামের এই কুকুরটিকে।

"কুকুর বলে কি মানুষ নই?" টিনটিনের দিকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছিল বিরক্ত কুট্টুস। তার এই কথার সমর্থনেই হাজির তারকা হয়ে ওঠা পশুপাখিরা। লিখেছেন

অভিজিৎ সুকুল

বছর ছত্রিশ আগের সেই দিনটার কথা পরিষ্কার মনে পড়ে ডেভিড করবেটের। সারা লন্ডন জুড়ে হইচই। দিনকয়েক আগে এক প্রদর্শনী থেকে চুরি গেছে জুলে রিমে ট্রফি, অথচ '৬৬-র বিশ্বকাপ কড়া নাড়ছে দোরগোড়ায়। হাজার চেষ্টা করেও পুলিশ খুঁজে পায়নি সেই ট্রফি। একদিন 'টেম্স রিভার বার্জ'-এর কর্মী ডেভিড তাঁর দক্ষিণ লন্ডনের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে বেরিয়েছিলেন টেলিফোন করতে। সঙ্গে তাঁর প্রিয় কুকুর পিকল্স। হঠাৎ ঝোপের আড়ালে একটা মোড়ক পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার করতে থাকে কুকুরটি। মোড়কটি খুলতেই ডেভিডের চক্ষুস্থির! এই তো সেই হারিয়ে যাওয়া জুলে রিমে ট্রফি, যার খোঁজে হন্যে হয়ে গেছে লন্ডন পুলিশ। হারানো মানিক খুঁজে দিয়ে রাতারাতি হিরো হয়ে গেল পিকল্স। একের পর এক সংবর্ধনায় পিকল্স যখন ক্লান্ত, তখনই এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তার। তবে পিকল্সকে ভোলেনি ব্রিটিশ ফুটবল। ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ জয়ী ইংল্যান্ড দলের কথা উঠলেই জিওফ হার্স্ট, ববি মুরদের সঙ্গে সমানভাবে উচ্চারিত হয় এই 'ক্যানাইন' ফুটবল-বন্ধুর নাম।



ডলি

মনে করা হয়, মানুষই ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টি। কিন্তু অনেক সময়েই মানুষের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছে তথাকথিত 'মনুষ্যেতর' জীবরা। শুধু টক্কর দেওয়াই নয়, পিকল্সের মতো কোথাও কোথাও হিউম্যান কাউন্টারপার্টকে ছাপিয়ে গেছে তারা। পিকল্সের কথা তো প্রথমেই বলা হল। এরকমই আর একজন হল লর্ড্স মাঠের সকলের প্রিয় 'পিটার দ্য ক্যাট'। ১৯৬৪-র নভেম্বরে মারা যায় পিটার। পরের বছর উইজডেন ক্রিকেট অ্যালমানাকের পাতায় জায়গা করে নিয়েছিল পিটারের 'ওবিচুয়ারি'। পিটারের মতোই সমান জনপ্রিয় এক নাম-না-জানা চড়ুই। ১৯৩৬-এর ৩ জুলাই লর্ড্সে জাহাঙ্গির খানের মারা বলের আঘাতে তার



প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সৌজন্যে যে কোনও সেলিব্রিটির সঙ্গে জনপ্রিয়তায় পাল্লা দেয় টেডি

মৃত্যু হয়। এখনও এম সি সি ক্রিকেট মিউজিয়ামের অন্যতম সেরা আকর্ষণ তার স্টাফ করা দেহ। শুধু ক্রিকেটে নয়, টেনিস জগতেও উপস্থিত মানুষের ডানাওয়ালা বন্ধুরা। সাম্প্রাস, আগাসি বা হিঙ্গিসের মতো মহাতারকাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও ২০০০ সালের উইম্বলডনে সেন্টার কোর্ট আর ইংরেজি ট্যাবলয়েডের পাতায় সমানভাবে জায়গা করে নিয়েছিল হামিশ নামের বাজপাখিটি। খেলা চলার সময় দুষ্টু পায়রাদের কোর্টে আনাগোনা বন্ধ করতে হামিশকে হাজিরা দিতে হত উইম্বলডনে।

তবে যতই পাখিদের পাবলিসিটি করা হোক, বিখ্যাত হওয়ার দৌড়ে অন্যান্য প্রাণীদের বেশ খানিকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে কুকুররা। সিনেমায় অভিনয় করা হোক বা মডেলিং, কিংবা তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির 'স্পোক্‌সঅ্যানিম্যাল', সবেতেই হাজির তারা। এ প্রসঙ্গে সবার আগে বলতে হয় 'জার্মান শেফার্ড অব দ্য মিলেনিয়াম' রিনটিনটিনের কথা। ১৯১৮ সালে লি ডানকান নামে এক মার্কিন সেনা অফিসার তাকে কুড়িয়ে পান ফ্রান্সের এক পরিত্যক্ত জার্মান ট্রেঞ্চে।১৯২২ সালে আমেরিকায় আসার পর ন' বছর ধরে প্রায় তিরিশটি হলিউডের ফিল্মে 'হিরো' সেজেছিল রিনটিনটিন। কেরিয়ারের 'পিক'-এ সপ্তাহে প্রায় ন' হাজার ডলার রোজগার ছিল তার। হিরে বসানো কলার, নিজের প্রোডাকশন ইউনিট, লিমুজিন, ড্রাইভার, শেফ বা পাঁচতারায় ভীষণভাবে অভ্যস্ত ছিল রিনটিনটিন। আদবকায়দার জীবনযাপনে খুব কাছাকাছিই থাকবে ল্যাসি। আসল নাম প্যাল। ১৯৪১-এ হলিউডে প্রথমবারের স্ক্রিন টেস্টে ডাহা ফেল করেছিল প্যাল। কিন্তু আবার সুযোগ আসে। 'ল্যাসি কাম হোম' ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করে 'ল্যাসি' নামেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কুকুরটি। এর পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। মার্কিন বায়ুসেনার একটি বি-১৭ বিমানের নাম দেওয়া হয় 'ল্যাসি কাম হোম'। এর থেকেই বোঝা যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কতটা জনপ্রিয় ছিল সে। ল্যাসির বংশধররাও প্রায় আটপুরুষ ধরে বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত।

অন্ধকার আঁস্তাকুড় থেকে কল্পনার রাজপ্রাসাদে উত্তরণ। নিপারকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে এভাবেই শুরু করা উচিত। বব্বি ব্রুক নামে এক ভদ্রমহিলা একটি বেওয়ারিশ কুকুরদের খোঁয়াড় থেকে আবিষ্কার করেছিলেন দুধসাদা শরীর আর কুচকুচে কালো দুই কানের অধিকারী নিপারকে। ২০টিরও বেশি বিজ্ঞাপনে অংশ নেওয়া নিপার ছিল আমেরিকার অ্যানিম্যাল মডেলদের মধ্যে ব্যস্ততম চরিত্র। ব্রুকের অ্যানিম্যাল রেসকিউ সেন্টারের প্রায় পুরোটাই চলত নিপারের রোজগারে।

যে কোনও চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষ লিওকে একডাকে চেনেন। মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের সব ছবিই শুরু হয় লিওর গর্জনে। ১৯২৮ সালে 'হোয়াইট শ্যাডোজ অব দ্য সাউথ সিজ' ছবি শুরুর আগে প্রথমবার পরদায় আসে লিও। তারপর থেকেই সে 'এম জি এম'-এর ট্রেডমার্ক। ১৯৩৮-এ ফিলাডেলফিয়ার চিড়িয়াখানায় মারা যায় লিও। তার মৃত্যুর পর স্ল্যাট্‌স, জ্যাকি, ট্যানার-রা লিওর হয়ে প্রক্সি দিয়েছে। লিওর আর এক জাতভাই মার্জান বিখ্যাত হয়ে ওঠে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়ার পর। তালিবানি অত্যাচারে এক চোখ হারানো



কিকো: অসলো থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে স্কালভিক খাঁড়িতে দেখতে পাওয়া গেছে তিমিটিকে

সিংহটিকে নিয়ে কম চিৎকার করেননি পশুপ্রেমীরা। তালিবানি সাম্রাজ্য পতনের পর সারা পৃথিবী থেকে মার্জানের জন্য সাহায্য আসতে থাকে। তবে তা উপভোগ করার জন্য বেশিদিন বেঁচে ছিল না সে।

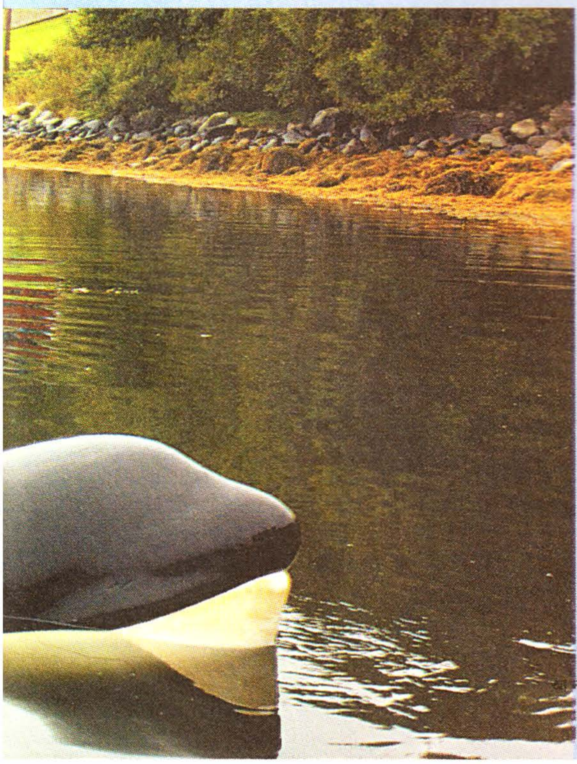
সাহিত্য আর সেলুলয়েড, দু'য়ের দৌলতে অমর হয়ে আছে এলসা। এলসার মতোই বাস্তবের আর এক চরিত্রকে নিয়ে হারমান মেলভিল লিখেছিলেন 'মবি ডিক'। মোচা ভিক নামে পরিচিত সাদা তিমিটি প্রায় ৩০ জন নাবিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। পিঠে ১৯টি হারপুন গাঁথা হিংস্র তিমি আর তিমি-শিকারি জাহাজে নাবিকের চাকরির অভিজ্ঞতা, এই দু'য়ের মিশেলে লেখা হয়েছিল বিখ্যাত সাহিত্য মবি ডিক। এলসার মতোই অমর মোচা ভিক।

'ফ্রি উইলি' দেখেছেন, অথচ 'কিকো'কে চেনেন না, এমন মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। সিনেমার উইলিই আসলে কিকো। ১৯৮৫তে মেক্সিকোর 'রেইনো অ্যাডভেঞ্চুরা' সাড়ে তিন লাখ ডলারে কিনে নেয় কিকোকে। ১৯৯২-এ ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এর বিখ্যাত ছবি ফ্রি উইলি তৈরি হল কিকোকে নিয়েই। তার দেখাশোনার জন্য দু' বছর পর তৈরি হয় কিকো ফাউন্ডেশন। '৯৫-এ দ্বিতীয়বার ফ্রি উইলি সাজে সে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিতর্কিত শব্দ 'ক্লোনিং'। 'নেচার' পত্রিকায় '৯৭-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর প্রথম ক্লোনড ভেড়া ডলির জন্মের কথা প্রকাশিত হওয়ার পর স্টিফেন হকিং থেকে বিল ক্লিনটন পর্যন্ত সকলেই নড়ে বসেছিলেন। স্কটল্যান্ডের রোজলিন ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞানী ইয়ান উইলমুটের তত্ত্বাবধানে জন্মেছিল ডলি। এ বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ফুসফুসের সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে তার। ১৯৫৭ সালে মহাকাশে পৃথিবী পরিক্রমার গৌরব অর্জন করলেও কুকুর লাইকা বেঁচেছিল মাত্র পাঁচদিন। অত্যধিক উত্তাপে ক্যাপসুলের মধ্যেই মারা যায় সে। লাইকার পরেও অবশ্য বেশ কয়েকবার কুকুর পাঠানো হয়েছে মহাকাশে, কিন্তু তাদের কেউই লাইকা হয়ে উঠতে পারেনি। তুলনায় অনেক বেশি সফল হ্যাম আর ইনোস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই শিম্পাঞ্জি। এদের মধ্যে ইনোস দু'বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। ১৯৬১তে মহাকাশে যায় সে। মহাকাশ ভ্রমণের পর বেশ কিছুদিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইনোসেরই দাপট ছিল।



এক দুঃখের কাহিনীর নায়ক: মার্জান



শুধু চেহারার বৈশিষ্ট্যের জোরেই বিখ্যাত অনেক পশু। কয়েক বছর আগে নর্থ ক্যারোলিনার পার্কার পরিবারে মাত্র ২৫ সেন্টিমিটারের চি হুয়াহুয়া গোত্রের কুকুর 'পিনাট্স'কে দেখতে যে ভিড়টা হত, সেটাই এখন হয় ব্যাঙ্ককের এক বাড়িতে ১২ সেন্টিমিটারের ইয়র্কশায়ার টেরিয়ার 'বিগ বস'-এর জন্য। ঠিক এরকমই দর্শনীয় স্কটল্যান্ডের 'স্নোবি'। ১৯৯৭ সালে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত তার দৈর্ঘ্য ছিল ৪১ ইঞ্চি। সবচেয়ে লম্বা বেড়াল হিসেবে এখনও তার নাম আছে গিনেসের পাতায়।

১৯০২ তে মিসিসিপিতে ভালুক শিকারে গিয়ে একটি অনাথ ভালুক বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। পরদিন ওয়াশিংটন পোস্টের পাতায় ঘটনাটি নিয়ে একটি কার্টুন প্রকাশিত হয়। কার্টুনের ভালুকটির অনুকরণে তৈরি হয় একটি পুতুল। রুজভেল্টের ডাকনাম অনুসারে তার নাম রাখা হয় 'টেডি'। তবে টেডি বিয়ারের এই ব্যাখ্যা মানতে রাজি নন জার্মানরা। তাঁদের মতে, মার্গারেট স্টিফ নামে এক ভদ্রমহিলা স্থানীয় চিড়িয়াখানার ভালুকের ছবি দেখে প্রথম টেডি বানান। টেডির ইতিহাস যা-ই হোক না কেন, সে সুপার-সেলিব্রিটি। একথার সমর্থনেই বোধহয় এবছর একশোয় পা দিল সে।

ফোটো: এ এফ পি, এ পি, পি টি আই

আনন্দমেলা টিনঠেক



"দূর, দুর, এ গানের আবার কোনও মানে হয় নাকি! 'খেলছে সচিন, খেলছে সচিন, মারছে সচিন ছয়', এ আবার একটা গান?" জোরগলায় চলতি বাংলা ব্যান্ডের গানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাল ফার্স্ট ইয়ারের প্রিয়াঙ্ক চৌধুরী। তা-ও আবার খোদ অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়ের সামনে! আধুনিক বাংলা গানকে একেবারে অন্য খাতে বইয়ে দেওয়ার জন্য যাঁর ব্যান্ড কৃতিত্বের দাবি রাখতেই পারে। তবে অনিন্দ্যকে মুখ খুলতে হল না। প্রিয়াঙ্কর কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রতিবাদ এল তারই এক সহপাঠী সুমন চক্রবর্তীর কাছ থেকে। 'চন্দ্রবিন্দু'-র আর এক প্রধান সদস্য চন্দ্রিল ভট্টাচার্যকে 'কোট' করে তার বক্তব্য, যদি কেউ কোনও গান বুঝতে না পারে, তা হলে সেটা তার সমস্যা। আইনস্টাইনের ফর্মুলা বা কিট্স-এর কবিতা অনেকের কাছে দুর্বোধ ঠেকতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেগুলো অর্থহীন। কেমিস্ট্রির দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তো রীতিমত আক্রমণাত্মক, "অনেকেই বাংলা ব্যান্ডের গানের উপর অর্থহীন তকমাটা লাগিয়ে দিতে চান। গাছকে তো কঠিন করে 'উদ্ভিদ' বলার কোনও দরকার নেই! সোজা কথা সহজ করে বলাই ভাল। যাদের জন্য গাওয়া হচ্ছে, সেই টার্গেট অডিয়েন্স ব্যাপারটা গ্রহণ করল কিনা, সেটাই আসল কথা।"

টিনএজারদের একমাত্র পত্রিকা আনন্দমেলার টিনঠেকের এবারের আড্ডা বসেছিল আশুতোষ কলেজের ঘরে। এক দঙ্গল টিনএজার ছেলেমেয়ের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডায় হাজির ছিলেন বাংলা ব্যান্ড 'চন্দ্রবিন্দু'-র লিড গায়ক অনিন্দ্য





পুরস্কার পেল যারা

চট্টোপাধ্যায় এবং গায়িকা নীপবীথি ঘোষ। গানের জগতের দু-দু'জন ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকার জন্যই বোধহয়, প্রথমেই গানের কথা উঠল। ছেলেমেয়েদের চাপানউতোর অনেকক্ষণ ধরে শোনার পর মুখ খুললেন অনিন্দ্য। তাঁর মতে, বাংলা গানের একটা পুরনো ধারা আছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। অনিন্দ্যর কথার রেশ টেনে দ্বিতীয় বর্ষের অর্ক জানাল, কথা আর সুর ঠিক থাকলে গানও ঠিক আছে। ব্যান্ড মানে দলবদ্ধ একটা ব্যাপার। সোলো গায়কের সঙ্গে যে সঙ্গতকারীরা থাকেন, তাঁরা প্রাপ্য মর্যাদা কোনওদিনই পান না। যত খ্যাতি, সব গায়কের আর যিনি তানপুরা বা তবলা বাজান, তাঁর নামটুকুও কেউ জানে না। ব্যান্ডে এ ব্যাপারটা একেবারেই নেই। খ্যাতি বা জনপ্রিয়তা সকলে সমানভাবে ভাগ করে নেন। অর্কর সঙ্গে একমত ফার্স্ট ইয়ার স্ট্যাটিসটিক্সের অর্ণব চক্রবর্তী। সত্যিই তো, সবকিছুরই যে একেবারে নির্দিষ্ট কোনও মানে থাকতে হবে, এমন কোনও কথা নেই।

তর্ক বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে রাশ টানলেন অনিন্দ্য, "পুরনো গানের সঙ্গে নতুন গানের তফাত থাকাটা খুব স্বাভাবিক। আমার বাবা-কাকারা একটা আদর্শের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তখন চারপাশে ব্যক্তিত্ব ছিলেন প্রচুর, যাঁদের সকলে ফলো করতে চাইত। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা নতুন কিছু করার কথা ভাবত। কিন্তু আমার ছেলেবেলা বা কৈশোর কেটেছে একটা 'খিচুড়ি সময়ে'। পুরনোদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে আমার চিন্তা মেলে না, কোনও দৃষ্টান্ত নেই, যে যারটা নিয়েই ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় আমি কথা বলতে পারব না। বা অতদূর না গিয়েও, সলিল চৌধুরীর ভাষাও কি আমার ভাষা? একটা সময় ছিল, যখন গান করলে বাড়ির লোকজন বিরক্ত হত। গানের ধারা প্রথম বদলান সুমন চট্টোপাধ্যায়। নচিকেতা, শিলাজিৎ, অঞ্জন দত্তরা আসার পর জীবনমুখী গানের বাড়বাড়ন্ত হতে থাকে।" এখান থেকেই আলোচনার সুতো ধরলেন নীপবীথি, "আগে হাতেগোনা কয়েকটা ম্যাগাজিন ছিল, আর এখন তো লিট্‌ল ম্যাগাজিনের রমরমা। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমন বাংলা ব্যান্ডের সংখ্যাও বেড়েছে। সবই তো আর সমান ভাল নয়!"

কথাবার্তা খুব একরকম হয়ে যাচ্ছে দেখে সঞ্চালক আলোচনার মোড় ঘোরালেন অন্যদিকে। আজকের টিনএজার এবং তাদের বাবা-মায়ের মধ্যে সমস্যার একটা বড় কারণ হল জেনারেশন গ্যাপ। ছেলেমেয়েদের চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবেই তাদের বাবা-মায়ের চেয়ে আলাদা। তা হলে অভিভাবকদের কতটা নিয়ন্ত্রণ ছেলেমেয়েরা মেনে নেবে? উত্তর দিলেন নীপবীথি, "ছেলেবেলায় বাবা-মায়ের গাইডেন্সটা খুব দরকার। কিন্তু বয়স বাড়লেও বাবা-মায়ের কাছে আমরা কখনওই বড় হই না। তাঁরা মনে করেন, আমরা নিজে নিজে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। তা ছাড়া তাঁদের নিজেদের ইচ্ছে ছেলেমেয়েদের মধ্যে দিয়ে পূরণের একটা ব্যাপারও থাকে। তাই আমরা কোন স্কুল বা কলেজে পড়ব, কী সাবজেক্ট নিয়ে পড়ব, সবেতেই মতামত দেন তাঁরা। কিন্তু যখন ছেলেমেয়েদের নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছে তৈরি হয়, তখনই সমস্যা আসে। যেহেতু ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বিদেশের মতো নয়, তাই ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকতে হয়। আর্থিক নির্ভরতার প্রশ্নও থাকে।" নীপবীথির কথার উত্তরে অনেকেই জানাল, তাদের সঙ্গে বাবা-মায়ের তেমন সমস্যা হয়নি। নীপবীথিও পালটা জবাব দিলেন, একটা সময় পর্যন্ত হয়তো কোনও ঝামেলা হয় না, কিন্তু ছেলেমেয়ের বেসিক ইচ্ছের সঙ্গে বাবা-মায়ের বেসিক ইচ্ছের বিরোধ হলে সমস্যা এড়ানো খুব কঠিন। অনিন্দ্য এমন কথাও বললেন যে, অনেক সময় পেরেন্টরা ছেলেমেয়েদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অনেক পড়ুয়া তাঁর সঙ্গে একমত হল, বেশিরভাগই হল না। অর্কর গলায় তো রীতিমত ঝাঁঝ, "মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেলা গল্প করলে কিছু হয় না, আর রাতে করলেই দোষ?" দেবজিৎ বলল, "বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের ম্যাচিওরিটি লেভেলটা বোঝেন না। ১৮ বছর বয়স হয়ে গেলেও অ্যাডাল্ট ফিল্ম দেখতে দিতে আপত্তি করেন। এটা ঠিক নয়।" ইকনমিক্সের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত। সে জানাল, বন্ধুর বাড়িতে থাকতে চাইলে বেশিরভাগ বাবা-মা আপত্তি করবেন না, কিন্তু রাত করে ফিরতে চাইলে বাধা দেবেন, কারণ একটা নিরাপত্তার প্রশ্নও থাকে। সবচেয়ে ব্যালান্স্‌ড দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া গেল ফার্স্ট ইয়ার স্ট্যাটিসটিক্সের বিশ্বজিৎ ঘোষের কাছ থেকে। যদিও তার বাবা-মা তাকে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দিয়েছেন, কিন্তু অনেক বাবা-মা ছেলেমেয়েদের ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করতে চান। তাঁদের উচিত একটা বয়সের পর ছেলেমেয়েদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া।

আড্ডার শেষে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছিল কুইজ কনটেস্ট। দশজন সঠিক উত্তরদাতাকে দেওয়া হয় ঝকঝকে আনন্দমেলা টিশার্ট। সেরা আড্ডাবাজের জন্যও ছিল পুরস্কার। অনিন্দ্য আর নীপবীথির বিচারে এই পুরস্কার পেল সেকেন্ড ইয়ার ইকনমিক্সের শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত।

মনীষা দাশগুপ্ত

ক্রিকেট বিশ্বকাপ থেকে

ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলার জন্য নয়, পারফরম্যান্সের অভাবেই কয়েকটি শক্তিশালী দল

পক্ষে



দীপ্তনারায়ণ দে
সপ্তম শ্রেণী
সেন্ট অগাস্টিন্‌স ডে স্কুল, কলকাতা

এই বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাই মূলত ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলার শিকার। এ ছাড়া আর কোনও দলের উপরে এর প্রভাব পড়েনি। যে শক্তিশালী দলগুলি হেরেছে, তারা ছিল হারের মুখে। এই দলগুলি আশানুরূপ খেলতে পারেনি। আর একটা কারণ দেখা গেছে, তা হল ক্রিকেটের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব, এই প্রভাবের ফলে তারা জিম্বাবোয়ে ও কেনিয়ায় খেলতে যায়নি, বিপক্ষ দলকে পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি, ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলার জন্য নয়, পারফরম্যান্সের অভাবেই এই দলগুলি হেরেছে।



শৌর্য দেব
একাদশ শ্রেণী
যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল, কলকাতা

ক্রিকেট-দুনিয়ার সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট বিশ্বকাপ। সেজন্য বিশ্বকাপেই বেশি অঘটন ঘটে। এই অঘটনের মধ্যে এবার দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড পড়েছে। এই শক্তিশালী দলগুলি সুপার সিক্সেই উঠতে পারেনি। সারা বছর ক্রিকেট খেলে এত ক্লান্ত যে, মূলপর্বে এসে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসও তাদের পতনের অন্যতম কারণ। তারা এখন ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলার ঘাড়ে দোষ দিয়ে নিজেদের অক্ষমতাকে আড়াল করতে চাইছে।



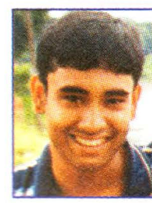
তনয় বাগ
একাদশ শ্রেণী
শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ
কলকাতা

ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলাকে দায়ী করে এখন অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওই দলগুলির পারফরম্যান্সের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই দলগুলি এমন কিছু খেলেনি যার জন্য বলা যাবে ওদের জেতা উচিত ছিল। আয়োজক দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার বাজে পারফরম্যান্স দেখা গেছে ওদের নিউজিল্যান্ড ম্যাচে। এই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিং ও ফিল্ডিং এত নিম্নমানের হয়েছিল যে, ম্যাচ হেরে যায়। এই শক্তিশালী দলগুলির ধারাবাহিকতা আদৌ বিশ্বমানের ছিল না।



দেবাশিস ঘোষ
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী
শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, সিউড়ি,
বীরভূম

এবারের বিশ্বকাপে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দল পারফরম্যান্সের অভাবেই আসর থেকে বিদায় নিয়েছে। যেখানে ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলা কার্যকর হয়েছে, সেখানে বরং একতরফা ক্লান্তিকর ম্যাচ দেখার হাত থেকে দর্শককে রেহাই দিয়েছে। সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কার কথাই ধরা যাক, অস্ট্রেলিয়ার বোলিং-বর্ম ভেদ করতে হিমশিম শ্রীলঙ্কা সাতটা উইকেট তো এমনিতেই খুইয়ে বসেছিল। এর পর ওদের কীই-বা করার ছিল? শ্রীলঙ্কার শেষের বিদায়ী চেহারা তখনই চোখের সামনে ভাসছিল। এখন ব্যর্থতা ঢাকতে কেউ ডাকওয়ার্থ-লুইসের দিকে আঙুল তুললে, সে আঙুল রক্তমাংসের নয়, অজুহাতের।



অর্কপ্রভ গঙ্গোপাধ্যায়
দ্বাদশ শ্রেণী
সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা

ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলা প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই ছিল। এই নিয়ম জেনে-বুঝে তবেই প্রতিটি দেশ মাঠে নেমেছে। তাই এই বিশ্বকাপের অঘটনের জন্য আর যাকে দোষ দেওয়া যাক, এই ফর্মুলাকে দায়ী করা যায় না।



মৈনাক সরকার
নবম শ্রেণী
বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয়

বিশ্বকাপ থেকে যে দলগুলি আকস্মিকভাবে ছিটকে গেছে, তাদের কোনওটিই তাকলাগানো পারফরম্যান্সের অধিকারী ছিল না। চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব ও টিমগেমের অভাব তাদের প্রত্যেকটি খেলায় দেখা গেছে। সুতরাং এখন নিয়মের দোহাই দেওয়াটা হাস্যকর।



শুভ্রময় নিয়োগী
একাদশ শ্রেণী
সেন্ট হেলেন স্কুল, কলকাতা

শুধুমাত্র একটি ফর্মুলাই এতগুলো দলের অসফলতার কারণ হতে পারে না। তাই যদি হত, তা হলে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত ফাইনালে উঠতে পারত না। ছিটকে যাওয়া দলগুলি, যাদের শক্তিশালী হিসেবে দেখা হচ্ছে, তাদের পারফরম্যান্সে শক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাদের রানরেটের গড় ছিল অত্যন্ত সাধারণ এবং জেতার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

ছিটকে গেছে

কী বলছে আনন্দমেলার বন্ধুরা



দেবলীনা নন্দী
একাদশ শ্রেণী
সরশুনা উচ্চ বিদ্যালয়, কলকাতা

শুধুমাত্র পারফরম্যান্সের অভাবেই কয়েকটি শক্তিশালী দল, বিশ্বকাপে তাদের যে জায়গায় যাওয়া উচিত ছিল, তা যেতে পারেনি। সবসময় শক্তিশালী দল যে ভাল খেলবে এবং জিতবে, এমনটা কিন্তু কখনও হয় না। ফুটবলেও হয় না। গত ফুটবল বিশ্বকাপে দেখা গেছে ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনা যথেষ্ট শক্তিশালী দল হয়েও হেরে গেছে। এর জন্য কোনও একটা নিয়মকে দোষ দেওয়ার অর্থ হয় না।



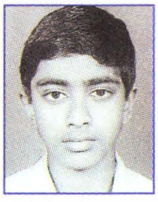
ঈপ্সিতা ভট্টাচার্য
অষ্টম শ্রেণী
ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা

ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা, এটা যেমন প্রতিটি দল জানে, তেমনি জানে, দক্ষিণ আফ্রিকায় এ-সময় যখন-তখন বৃষ্টি হয়। সম্ভাব্য বৃষ্টির জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হওয়া খেলারই মধ্যে পড়ে। শক্তিশালী দল ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলা জানত না, একথা বিশ্বাস হয় না। তারা হেরেছে এই নিয়মের জন্য নয়, নেহাতই পারফরম্যান্সের জন্য।



মোঃ সাদিদুল আলম
বি এ (অনার্স), প্রথম বর্ষ
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে গেলে সকলের আগে প্রয়োজন ভাল পারফরম্যান্স। এবারের বিশ্বকাপে কয়েকটি শক্তিশালী দল ব্যর্থ হয়েছে শুধুমাত্র ঠিক সময়ে ভাল পারফরম্যান্স করতে না পারায়। ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলার জন্য তারা একটা-দুটো ম্যাচে বিপাকে পড়েছে সত্যি, কিন্তু বাকি ম্যাচগুলোতে যদি ভাল করতে পারত, তা হলে বিশ্বকাপের আসর থেকে এভাবে ছিটকে যেতে হত না।



সুতনু দত্ত
নবম শ্রেণী
লক্ষ্মীপুর স্বামীজি সেবা সঙ্ঘ উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগনা

এবারের বিশ্বকাপে বৃষ্টির জন্য ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলার সাহায্য নিতে হয়েছে আই সি সি-কে। বৃষ্টি-বিঘ্নিত খেলায় জিততে গেলে যে ধরনের খেলতে হত, তা দক্ষিণ আফ্রিকাসহ হেরে যাওয়া শক্তিশালী দলগুলি কেউই পারেনি। এই দলগুলি ভাল খেলতে না পারার জন্যই হেরেছে, ফর্মুলার জন্য নয়।



শুভঙ্কর মণ্ডল
একাদশ শ্রেণী
কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল, নদিয়া

এই বিশ্বকাপে ডাকওয়ার্থ-লুইস সিস্টেম কোনও দলকেই ঠকায়নি। এই সিস্টেমের মোদ্দা কথা ছিল, পরে ব্যাট করা কোনও দলের টার্গেট স্কোর তাদের উইকেট পতনের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বাড়বে। যে দলের উইকেট যত কম পড়বে, তাদের রান তাড়া করে জেতার সম্ভাবনা তত বেশি। জিততে পারেনি ভাল পারফরম্যান্স করতে পারেনি বলে। এই দলগুলি নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতেই ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলার দোহাই দিচ্ছে।



জয় নস্কর
দ্বাদশ শ্রেণী
কে টি পি পি হাই স্কুল পূর্ব মেদিনীপুর

যেসব শক্তিশালী দল বিশ্বকাপ থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ নিতে পারল না, ছিটকে গেল, তারা কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গেই অবস্থান করে আসছে। এই দলগুলিও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ফর্মুলার দোষ দিচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার মতো আপাদমস্তক পেশাদার দলও হেরে যাওয়ার জন্য ডাকওয়ার্থ-লুইস সিস্টেমকে দায়ী করেছে দেখে আমরা অবাক হচ্ছি। এই দলগুলি যোগ্যতা অনুযায়ী খেলতে পারেনি, তাদের হারের কারণ অন্যকিছু নয়, পারফরম্যান্স।

বিপক্ষে



দেবলীনা ঘোষ
একাদশ শ্রেণী
শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুল

ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলা বিজ্ঞানসম্মত হলেও এর প্রয়োগ বাস্তবোচিত নয়। গ্রুপ লিগে কেনিয়া ২১ ওভারের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে গেলেও সুপার সিক্সে ওঠে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা উঠতে পারেনি। এই বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটা ছিল অসাধারণ। কিন্তু বাংলাদেশের মতো টিম যারা গত কয়েক বছর ধরে একটা ম্যাচও প্রায় জিততে পারেনি, তাদের সঙ্গেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়। এই বিশ্রী নিয়মের জন্যই আটকে গেল পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড। যারা সুপার সিক্সে পৌঁছনো কেনিয়া ও জিম্বাবোয়েকে যে-কোনও পরিস্থিতিতে সহজেই হারাতে

---

২০ মে সংখ্যার বিতর্কের বিষয়: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার হিড়িকে সর্বভারতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালি ছেলেমেয়েরা পিছিয়ে পড়ছে

আনন্দমেলার যেসব পাঠক-পাঠিকা এই বিতর্কে অংশ নিতে চাও, তারা অবশ্যই মতামত জানাও **১০ মে-র মধ্যে।** *খামের উপরে স্পষ্ট করে লিখতে হবে 'আনন্দমেলা বিতর্ক বিভাগ' কথাটি। চিঠিতে উল্লেখ করতে হবে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, বাড়ির ঠিকানা এবং ফোন নম্বর। চিঠির সঙ্গে পাঠাতে হবে রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ফোটোগ্রাফ। তোমাদের মতামত যেন ১০০ শব্দের বেশি না হয়। চিঠি পাঠাও এই ঠিকানায়:*

আনন্দমেলা
বিতর্ক বিভাগ
সম্পাদক, আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

বিতর্কে অংশ নিতে হলে পক্ষ বা বিপক্ষ যে-কোনও একটিতেই পরিষ্কারভাবে অবস্থান করতে হবে। দু' দিকেই মত দিলে সে চিঠি গ্রাহ্য হবে না।

সেরা চিঠি



বিপক্ষে

দেবলীনা বেরা
দ্বিতীয় বর্ষ (ইংরেজি অনার্স)
মেদিনীপুর কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতির কবলে পড়েই কয়েকটি শক্তিশালী দল ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসর থেকে ছিটকে গেছে। শেষমুহূর্তে রানের হিসেব ঠিকমতো না করতে পারা, বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সীমায়িত বলে অবাস্তব রান ও খেলার অতিরিক্ত দিনের অভাবে পয়েন্টের সমবন্টন—গুঁড়িয়ে দিয়েছে আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকাসহ কয়েকটি দেশের স্বপ্ন। আর নিয়মের আনুকূল্যে কেনিয়া ও জিম্বাবোয়ের মতো দুর্বল দলগুলি উপস্থিত হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে। ফলে, ক্রিকেটের বাকি ম্যাচগুলো যেন একপেশে হয়ে গেছে। খেলায় অবশ্যই নিয়ম থাকবে, তবে এরকম জটিল, দুর্বোধ নিয়মের বেড়াজালে না গিয়ে খেলার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। না হলে ক্রিকেটের ক্রিকেটত্ব হারিয়ে সবাই ফর্মুলা মেনে অঙ্ক কষায় ব্যস্ত হবে। এই বিশ্বকাপে তাই ঘটেছে। সুতরাং পারফরম্যান্স নয়, ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়েছে কয়েকটি যোগ্য দলকে।

পারে। সুতরাং ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলার ফলে অনেকগুলি শক্তিশালী দলের ২০০৩ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া শুধু বিস্ময়করই নয়, মর্মান্তিকও।



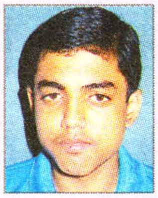
পৌলমী মণ্ডল
নবম শ্রেণী
দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, কোচবিহার

দেশের মাটিতে খেলেও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো স্পিরিটেড টিম সুপার সিক্সে যেতে পারল না। অথচ এই টিম ছিল ২০০৩ বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিল যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সে হঠাৎ মাঝপথেই মুখ থুবড়ে পড়ল। আবার কেনিয়ার মতো একটা অখ্যাত দল জায়গা করে নিল। কিন্তু একথা কখনওই বলা যাবে না কেনিয়া তাদের যোগ্যতাতেই চূড়ান্ত চারে উঠে এসেছে, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের পারফরম্যান্সের অভাবেই হেরে গেছে। এর মূল কারণ ডাকওয়ার্থ-লুইস সিস্টেম। ভাল খেলাই জয়ের মাপকাঠি না হয়ে অঘটনের বিশ্বকাপ হিসেবে ২০০৩ চিহ্নিত হয়ে গেল।



মৌপর্ণা দাস
একাদশ শ্রেণী
ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা

এবারের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে দলগত পারফরম্যান্সের চেয়ে ডাকওয়ার্থ লুইসই যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অনেক যোগ্য দল, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পিছনে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতির হাত আছে। ডাকওয়ার্থ-লুইসের শিকার না হলে হয়তো অনেক দল টিকে যেতে পারত। বৃষ্টির হাত থেকে একটা খেলাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিকে অবলম্বন না করে বোধ হয় পরিত্যক্ত ম্যাচ হিসেবে অতিরিক্ত দিন রেখে খেলালে তা যুক্তিযুক্ত হত। এতে অন্তত একটা টিমের সঠিক যোগ্যতা প্রমাণ করা যেত। সেই কারণে এবারের বিশ্বকাপ হয়তো 'আই. সি. সি. বিশ্বকাপ ২০০৩' না হয়ে 'ডাকওয়ার্থ-লুইস বিশ্বকাপ ২০০৩' হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।



হিতেশ সেন
একাদশ শ্রেণী
গরলগাছা হাই স্কুল, ডানকুনি

ক্রিকেটে পারফরম্যান্সের চেয়ে ভাগ্যের অনেক বেশি সহায়তা দরকার। এবারও বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলের পারফরম্যান্স খুব একটা খারাপ ছিল না। কিন্তু ভাগ্য তাদের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। এই ভাগ্যই হল ডাকওয়ার্থ-লুইস ফরমুলা। এই ফরমুলার জন্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বাংলাদেশের মতো একটা কমজোরি দলের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে নিতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে জেতার মতো অবস্থায় থাকলেও বৃষ্টির জন্য ডাকওয়ার্থ-লুইস মতবাদ অনুসারে তারা হেরে গেল ও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল। তাই ডাকওয়ার্থ-লুইস ফরমুলাকেই এখানে দায়ী করা যেতে পারে।



দেবোপম ঘোষ
অষ্টম শ্রেণী
ঝাড়গ্রাম কুমুদকুমারী ইনস্টিটিউশন, পশ্চিম মেদিনীপুর

এই বিশ্বকাপে আই সি সি-র টিম র‍্যাঙ্কিং অনুসারে প্রথম ছ'টি দলের মধ্যে সুপার সিক্সে উঠেছে মাত্র দু'টি দল (অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কা)। তার মানে বাকি দলগুলির পারফরম্যান্স খারাপ ছিল। কিন্তু আমার মতে এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তা না হলে কেনিয়া কখনও সেমিফাইনালে ওঠে। এর জন্য অবশ্যই ডাকওয়ার্থ-লুইস ফর্মুলা দায়ী। এই ফর্মুলার শিকার হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড। আবার লাভবান হয়েছে, জিম্বাবোয়ে ও কেনিয়ার মতো নগণ্য দল।



বিজয় সরকার
দ্বিতীয় বর্ষ (বি এসসি)
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া

ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতি ক্রিকেটের ক্ষেত্রে অভিশাপ। এই অভিশাপের শিকার বিশ্বকাপের কয়েকটি শক্তিশালী দল। কোনও দলের প্রাথমিক পারফরম্যান্স খারাপ হতেই পারে, পরে তা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু ডাকওয়ার্থ-লুইসের মতো ফর্মুলা যদি থাকে তা হলে এই প্রাথমিক পর্বেই বিদায় নিতে হয়। তাই ঘটেছে বেশ কয়েকটি দলের ভাগ্যে।



দেবাংশু চট্টোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং
বি ই কলেজ, শিবপুর, হাওড়া

ক্রিকেট খেলায় ষাট শতাংশ পারফরম্যান্স এবং চল্লিশ শতাংশ ভাগ্যের উপর। কোনও খেলোয়াড়ই যন্ত্র নয়, তারও টেনশন হয়, ভাল ব্যাট করতে গিয়ে হঠাৎ আউট হয়ে যায়। সাধারণ দিনে এই পদ্ধতির কোনও ভূমিকা থাকে না, কিন্তু বৃষ্টি বা অন্য কোনও দুর্যোগ ঘটলে এই পদ্ধতির জটিল হিসেব শুরু হয়ে যায়। এমনিতে বৃষ্টি-ভেজা মাঠ, পিচের অবস্থা ভয়াবহ। এসব ক্ষেত্রে ব্যাটস্‌ম্যানের উপর অসম্ভব চাপ পড়ে। এই চাপ নিতে দক্ষিণ আফ্রিকাও হিমশিম খেয়েছে এবং হেরেছে। তাই পারফরম্যান্স নয়, দায়ী দুর্ভাগ্য, দায়ী ফর্মুলা।

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের মনে হয় বিতর্কের অনেক চিঠিই সঠিক মানে পৌঁছতে পারছে না। চিঠি হতে হবে 'টু দ্য পয়েন্ট'। চিঠি লেখার আগে ভালভাবে ভেবে নিতে হবে, কী চাওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ক্রিকেটের 'রেন রুল' কতটা কার্যকর, তা লিখতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট টিমের সুখ্যাতি করার কোনও মানে নেই।
অনেক চিঠি কাজ হয়ে যাওয়ার পর এসে পৌঁছচ্ছে, সেজন্য আরও আগে পাঠানোর অনুরোধ করছি।

বছরের সেরা দিউফ

পরপর দু'বার আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতলেন সেনেগালের এল হাদজি দিউফ। লিখেছেন **সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়**

ফুটবলের জগতেও কি রয়েছে অলিখিত বর্ণবৈষম্য? প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ক্রিকেট খেলাটা শুরু করেছিল ব্রিটিশরা, সেখান থেকেই ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা বিস্তৃতি পায়। তাই ক্রিকেটটা অনেকের কাছেই সাদা চামড়াদের খেলা। কিন্তু ফুটবলের ব্যাপারটা অন্য। এখানে প্রথম থেকেই রাজত্ব করে এসেছেন কালোরা। ফুটবলের মুকুটহীন সম্রাট পেলের কথা ছেড়ে দিলেও গ্যারিঞ্চা, ইউসেবিও, রজার মিল্লার মতো বহু তারকা উঠেছেন খ্যাতির পাহাড়চুড়োয়। অথচ সেনেগালের এল হাদজি দিউফ আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হওয়ার পরও তাঁর সম্পর্কে অদ্ভুতভাবে নিস্পৃহ সারা পৃথিবীর ফুটবল-মিডিয়া।

ফিফার বর্ষসেরা তো বটেই, ইউরোপ, এমনকী লাতিন আমেরিকার সেরা ফুটবলারকে নিয়েও যেভাবে মাতামাতি করে বিশ্বের সেরা ফুটবল পত্রিকাগুলো, আফ্রিকা বা এশিয়ার বর্ষসেরাকে নিয়ে কিন্তু তেমনটি দেখা যায় না। যদিও বহুদিন ধরেই বিশ্বসেরা ফুটবলারদের আঁতুড়ঘর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে এই দুই মহাদেশ।

ফ্রান্স বা ইতালির নামীদামি ক্রীড়া পত্রিকাগুলো মাতামাতি করুক বা না করুক, দিউফের কৃতিত্ব একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। তারই স্বীকৃতি হিসেবে কিছুদিন আগে জোহানেসবার্গে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল আফ্রিকান ফুটবলার অব দ্য ইয়ারের ঝকঝকে ট্রফি। এই নিয়ে পরপর দু'বার আফ্রিকার বর্ষসেরা হলেন দিউফ। তাঁর আগে আবেদি পেলে (ব্রাজিলের পেলে নন কিন্তু) এবং জর্জ উইয়া আফ্রিকার সেরা ফুটবলারের তকমা পেয়েছেন এবং দুজনই ফুটবল-জগতের 'লিভিং লেজেন্ড'। প্রথমজন অর্থাৎ আবেদি পেলে ১৯৯১ থেকে '৯৩-এর মধ্যে পরপর তিনবার বর্ষসেরা হয়ে ইতিহাসে ঢুকে গিয়েছেন। উইয়াও এই খেতাব জিতেছেন তিনবার। তার মধ্যে '৯৪-'৯৫ মরসুমে পরপর দুবার সেরা নির্বাচিত হন তিনি।

এবার আফ্রিকার বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে দিউফের সঙ্গে ছিলেন আরও দুজন — একজন দিউফের সতীর্থ পাপা দিউফ এবং অন্যজন মিশরের আহমদ 'মিজে' হোসাম। শেষ পর্যন্ত দুজনকেই লড়াই থেকে ছিটকে যেতে হয়। গত মরসুমে যখন দিউফ প্রথমবার বর্ষসেরা নির্বাচিত হন, তখন ফুটবল-বিশ্বে তাঁর নাম সেভাবে ছড়ায়নি। জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বকাপই তাঁর পৃথিবীটা আমূল বদলে দিয়েছে। সোলে উদ্বোধনী ম্যাচে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে আলোড়ন ফেলে দেয় আফ্রিকার সিংহরা। সেনেগালের ফুটবল ইতিহাসে ফ্রান্সকে হারানোর ঘটনাটা প্রায় রূপকথার মতো। জিদান, অঁরি, ত্রেজেগুয়েদের ছাপিয়ে গিয়েছিলেন দিউফ।

বিশ্বকাপ শেষ হতে না হতেই লিভারপুল দলে ডাক পান দিউফ। তবে যেমন ভাবা হয়েছিল, ইংল্যান্ডে গিয়ে তেমন সাফল্য পাচ্ছেন না তিনি।



এফ এ কাপে লিভারপুলের একটি ম্যাচে এল হাদজি দিউফ (বাঁ দিকে)
ফোটো: এ এফ পি

শিরোনামে ভারতীয়

বড় ম্যাচ জেতার জন্য সবসময় ভারত নির্ভর করে এসেছে তার পৃথিবী কাঁপানো ব্যাটিং লাইনআপের উপর। ২০০৩ বিশ্বকাপেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হল, ব্যাট্‌সম্যানদের ছাপিয়ে উঠে এলেন পেস বোলাররা। লিখেছেন **সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়**


আশিস নেহরা

হল না। একশো কোটি মানুষের যাবতীয় আশায় জল ঢেলে ২০০৩ বিশ্বকাপ থেকে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরতে হল ভারতকে। জোহানেসবার্গের ফাইনালে ৩৫৯ রানের পাহাড়প্রমাণ টার্গেট খাড়া করে হাসতে হাসতে কাপ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত জিতবে, এমন আশা করাটা বেশ বাড়াবাড়ির পর্যায়েই পড়ে, তবুও স্বপ্ন দেখতে কসুর করেননি ভারতীয় সমর্থকরা। তাঁদের জন্য আশার কথা একটাই, '৮৩-র এনকোর না হলেও এই ভারতীয় দল কিন্তু স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। জেতার খিদেটা সর্বোচ্চ মঞ্চে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও তারা একশো শতাংশ সফল। এই প্রথম বোলাররা দেখিয়েছেন তাঁরাও পারেন।

সারা পৃথিবীর ফাস্ট বোলারদের এখন তিনটে ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়, লাইটনিং ফাস্ট, সুপার ফাস্ট এবং এক্সপ্রেস ফাস্ট। ঘটনা হল, তার একটার চূড়োয় আছেন এক ভারতীয় ক্রিকেটার। তা-ও এমন একজন ক্রিকেটার, যাঁকে মাসকয়েক আগে ফিটনেসের অভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে বসে থাকতে হয়েছিল। ব্রেট লি যদি এবারের বিশ্বকাপে গতির কারণে জেফ টমসনকে মনে করিয়ে থাকেন, তা হলে আশিস নেহরা তার চেয়েও কিছু বেশি। দিল্লির রোগা-পাতলা চেহারার এই পেস বোলার ধারাবাহিকভাবে যে গতিতে বল করেছেন, তেমন গতি কোনও ভারতীয়র বলে এতদিন দেখা যায়নি।

বিশ্বকাপের ২৮ বছরের ইতিহাসে এবারের টুর্নামেন্টটি বৃহত্তম তথা দীর্ঘতম। ৪৩ দিনে খেলা হয়েছে মোট ৫৪টি ম্যাচ। দুই ফাইনালিস্ট, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া ১১টি করে ম্যাচ খেলেছে। সুপার সিক্স পর্যন্ত প্রতিটি দলকে ন'টি করে ম্যাচ খেলতে হয়েছে। প্রথম রাউন্ডেই ছিটকে যাওয়া আটটি দলও ন্যূনতম ৬টি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটগুলোও ছিল একদিনের ম্যাচের পক্ষে আদর্শ। এখানকার উইকেটে যে পরিমাণ ঘাস ছেড়ে রাখা হয়, পিচে যেমন বাড়তি গতি আর বাউন্স থাকে, সারা দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও পিচে তা ছিল না। একমাত্র পোর্ট এলিজাবেথের পিচেই খানিকটা স্লো টার্ন ছিল। ওয়ান ডে-তে বড় রান আর তাকে তাড়া করে আরও বড় রানের ইনিংস দেখতেই দর্শক মাঠে ভিড় জমায়, এই আপ্তবাক্য মাথায় রেখে বিশ্বকাপের রূপকার আলি বাখার যথেষ্ট ব্যাটিং-সহায়ক পিচই তৈরি রেখেছিলেন।

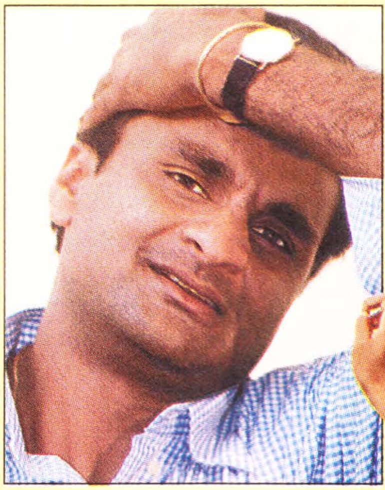
তাতেও দমানো যায়নি লাইটনিং ফাস্ট, সুপার ফাস্ট বা এক্সপ্রেস ফাস্ট বোলারদের। শোয়েব আখতারের হাত থেকে ঘণ্টায় ১৬১.৩ কিলোমিটার বেগে ডেলিভারি বেরিয়েছে, ব্রেট লি বল করেছেন ১৬০.৭ কি.মি. বেগে। শেন বন্ডের ১৫৩.৪ কি.মি. বা জেরেমি লসনের ১৫৩.২ কি.মি.-র ডেলিভারিও দেখেছে বিশ্বকাপ। এঁদের ঠিক পরেই আছেন ভারতের আশিস নেহরা, বলের গতি ঘণ্টায় ১৪৯.৭ কি. মি.। এক্সপ্রেস ফাস্ট বোলারদের তালিকায় একনম্বর নেহরা। একই ক্যাটেগরিতে আছেন মাখায়া এনতিনি (১৪৯.৪ কি.মি.), গিলেসপি (১৪৮.৩ কি.মি.), দিলহারা ফার্নান্ডো (১৪৭. ৯ কি.মি.), জাহির খান (১৪৭.৯ কি.মি.), অ্যান্ডি বিকেল (১৪৬.১ কি.মি.) এবং ব্লিগনট (১৪৫.৬ কি.মি.)।

তা হলে ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে তা হল, বিশ্বকাপে ভারতের তিন পেসারের মধ্যে দুজন পড়ছেন এক্সপ্রেস ফাস্ট ক্যাটেগরিতে। পেসত্রয়ীর সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ জাভাগল শ্রীনাথও খুব বেশি পিছিয়ে নেই। তিনিও ধারাবাহিক গতিতে বল করেছেন বিশ্বকাপে, ঘণ্টায় ১৩৩ থেকে ১৩৯ কিলোমিটারের মধ্যে। নিছক গতিই নয়, নেহরা-জাহির-শ্রীনাথরা লাইন লেংথেও যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। ফাইনাল বাদ দিলে বাকি ম্যাচগুলোতে তিনজনের বোলিং-স্ট্যাটিসটিক্সই তার প্রমাণ। ১১ ম্যাচে জাহির ১৮ উইকেট (গড় ১৭.০৫), শ্রীনাথ ১৬ উইকেট (গড় ১৭.৬২), দুটো ম্যাচ কম খেলে নেহরা ১৫ উইকেট (গড় ১৫.৪৬)। কোনও বড় একদিনের টুর্নামেন্টে একবারই ভারতীয়রা এর কাছাকাছি পারফরম্যান্স করেছেন। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে রজার বিনির ১৮ উইকেট, মদনলালের ১৭ উইকেট এবং কপিলদেবের ১২ উইকেট।

বিনি, মদনলাল এবং কপিল, তিনজনই ছিলেন মিডিয়াম পেসার। ধারাবাহিক বোলিং স্পিড ছিল ১২৫ থেকে ১৩০ কিলোমিটারের ভিতর। '৮৫-র ওয়ার্ল্ড সিরিজ চ্যাম্পিয়নশিপে ঝুড়িঝুড়ি উইকেট তুলে নিয়েছিলেন এই তিন মিডিয়াম পেসার। উপমহাদেশের বাইরে ভারতের শেষ টেস্ট সিরিজ

পেসাররা

জয়ের পিছনেও বিনি ও মদনলালের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। '৮৬ -তে কপিলের ভারত তিন টেস্টের সিরিজে ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডকে ২-০ ফলে হারিয়েছিল, একটি ম্যাচে বিনি ১০ উইকেট পেয়েছিলেন। সিরিজে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছিলেন মদনলাল। নব্বইয়ের দশকে কপিল-মনোজ প্রভাকর-শ্রীনাথ সমৃদ্ধ বোলিং অ্যাটাকও মোটেই ফেলে দেওয়ার মতো ছিল না। সুইং-পেস-রিভার্স সুইংয়ের মিশ্রণে এঁরা মাঝে-মাঝে প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানের কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতেন।



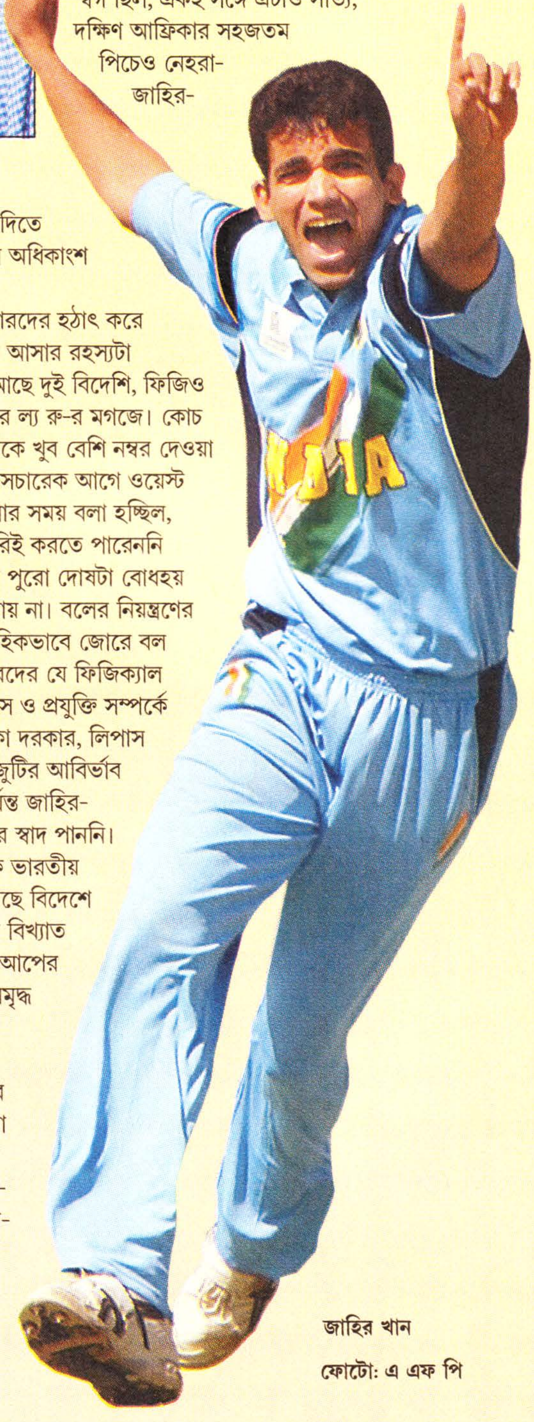
জাভাগল শ্রীনাথ

আরও পিছিয়ে গেলে একে একে ভেসে উঠবেন রমাকান্ত দেশাই-রুসি সুর্তি-আবিদ আলি, দাত্তু ফাদকর, সুব্রত গুহ, করসন ঘাউড়ি, সুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, লালা অমরনাথ এবং অবশ্যই মহম্মদ নিসার-অমর সিংহের কিংবদন্তি পেস বোলিং জুটি। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এঁদের নিয়ে কমবেশি অনেক 'মিথ'। কিন্তু মিথ যা-ই হোক, প্রযুক্তি জানাচ্ছে যে, এবারের বিশ্বকাপে জাহির-নেহরা যে গতিতে বল করেছেন, নিসার-অমর সিংহ ছাড়া আর কোনও ভারতীয় বোলার ধারাবাহিকভাবে এত জোরে বল করতে পারেননি। কপিলদেবের বোলিং নিয়ে প্রচুর কথা বলা হয়, কিন্তু জীবনের প্রথম পাকিস্তান সফর ও দেশে ফিরে কালিচরণের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজের পরেই কপিল তাঁর বলের গতি কমিয়ে সুইং এবং আরও পরের দিকে রিভার্স সুইংয়ের দিকে বেশি করে মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। ৪৩৪টি টেস্ট উইকেটের মালিক তাঁর ১৭ বছরের দীর্ঘ পেস বোলিং কেরিয়ারের গোড়ার বছরদুয়েকের মধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন, চোট-আঘাত সামলে সফল বোলার হিসেবে লম্বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটজীবন কাটাতে হলে গতির পিছনে না ছুটে বলের কারিকুরির দিকে নজর দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশেষত, ভারতের শুকনো উইকেটে জোরে বোলিং মানেই পেসারের হাঁটু আর গোড়ালির দফারফা। কপিল তাই মিডিয়াম পেসকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য শ্রীনাথও তাই। '৯২-এর শ্রীনাথ পরের দু' বছরের মধ্যেই ফাস্ট-মিডিয়াম ক্যাটেগরি থেকে নিজেকে মিডিয়াম পেসারে নামিয়ে আনেন। বাকিরা তো বরাবরই মিডিয়াম পেসার। রমাকান্ত দেশাই ওরই মধ্যে কিছুটা জোরে বল করতেন। সুঁটে বা মন্টুর বলে জোর থাকলেও তাঁদের টেস্টজীবন সংক্ষিপ্ততম।

সেদিক থেকে নেহরা-জাহিরদের সেরা বলার জন্য আরও দু'-একটা সিরিজ অপেক্ষা করা দরকার। কিন্তু ২০০৩-এর প্রথম তিন মাসে, অর্থাৎ নিউজিল্যান্ড সফর থেকে তাঁরা যে ধারাবাহিক গতি, নিয়ন্ত্রণ, সুইং, সিম, কাট, রিভার্স সুইং, ইয়র্কার, বাউন্সারের নমুনা রেখেছেন, তা মনে রাখার মতো। ক্রিকেটের দুটো ভার্সানেই বর্তমান ভারতীয় পেস আক্রমণ সফল। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, নিউজিল্যান্ডের উইকেট জোরে বোলারদের কাছে স্বর্গ ছিল, একই সঙ্গে এটাও সত্যি, দক্ষিণ আফ্রিকার সহজতম পিচেও নেহরা-জাহির-শ্রীনাথকে সামাল দিতে হিমশিম খেয়েছেন অধিকাংশ ব্যাট্‌সম্যান।

ভারতীয় পেসারদের হঠাৎ করে সর্বোচ্চ স্তরে উঠে আসার রহস্যটা বোধহয় লুকিয়ে আছে দুই বিদেশি, ফিজিও লিপাস এবং ট্রেনার ল্য রু-র মগজে। কোচ হিসেবে জন রাইটকে খুব বেশি নম্বর দেওয়া যাবে না, কারণ মাসচারেক আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ চলার সময় বলা হচ্ছিল, বিদেশি কোচ তৈরিই করতে পারেননি বোলারদের। তবে পুরো দোষটা বোধহয় রাইটকে দেওয়া যায় না। বলের নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে জোরে বল করার জন্য পেসারদের যে ফিজিক্যাল কন্ডিশনিং, ফিটনেস ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যে জ্ঞান থাকা দরকার, লিপাস এবং ল্য রু জুটির আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত জাহির-নেহরারা তার স্বাদ পাননি। যেদিন থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বুঝেছে বিদেশে জেতার জন্য বিখ্যাত ব্যাটিং লাইনআপের সঙ্গে পেস-সমৃদ্ধ বোলিং শক্তিরও প্রয়োজন, সেদিন থেকেই নেহরাদের বলে ম্যাজিক দেখা যাচ্ছে।

নেহরা-জাহির-শ্রীনাথ নয়, নেহরা-জাহির-শ্রীনাথ-লিপাস-ল্য রু, এটাই ভারতের সেরা পেস আক্রমণ!



জাহির খান

ফোটো: এ এফ পি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইট বেসবল দল কলকাতায় এসে শিখিয়ে গেল এই খেলা। জানিয়েছেন **চন্দন রুদ্র**



'ব্যাটার' সন্তোষ পাণ্ডে

কিছুদিন আগেও কলকাতার সল্ট লেক অঞ্চলে সাইতে ফেন্সিং শিখতে যেত ভিক্টর দে। সাবজুনিয়ার ন্যাশনালে নেমে জয়পুর থেকে রুপোও জিতে এনেছিল সে। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার হাজরার চিলড্রেন্স অ্যাকাডেমির অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রটিকে আর তরোয়ালের লড়াই টানে না। বেসবল এখন তার প্রিয় খেলা। সম্প্রতি এই শহরে বেসবল খেলার সুযোগ তৈরি হওয়ায় শুধু ভিক্টরই নয়, বেসবলে ক্রমশ কলকাতার অনেক স্কুলপড়ুয়ারই আগ্রহ বাড়ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় খেলা বেসবল। জন্মও সেখানেই। ক্রিকেটের সঙ্গে বেসবলের অনেকটাই মিল আছে। এই খেলায় ব্যাট আছে, বল আছে। দুটি দলের রানের পার্থক্যই জয়-পরাজয় ঠিক করে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত হয় বেসবলের পেশাদার জাতীয় লিগ। আমাদের দেশের ক্রিকেটের রঞ্জি ট্রফির মতো ওদেশে হয় বেসবলের 'মেজর লিগ ওয়ার্ল্ড সিরিজ'। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন? ওলিম্পিক গেম্‌সে অন্তর্ভূত হওয়ার পর ক্রিকেটের চেয়ে অনেক বেশি দেশে এখন বেসবল খেলা হয়। এশিয়ার দুটি দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ফুটবলের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বেসবল। ইউরোপে খেলা জাপানের ফুটবল-নক্ষত্র হিদেতোশি নাকাতার মতো সে-দেশে জনপ্রিয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগে খেলা বেসবল তারকা ইচিরো সুজুকি। মেজর লিগের সফল খেলোয়াড় কিম বিউং হুম এবং পার্ক হ্যান চো দক্ষিণ কোরিয়ার দুই জনপ্রিয় বেসবল খেলোয়াড়। গতবারের বিশ্বকাপ ফুটবল শুরুর ২০দিন আগেও কোরিয়ার সংবাদপত্রগুলিতে বেসবলের বাড়বাড়ন্ত দেখে দক্ষিণ কোরিয়ায় ফুটবল নয়, বেসবল প্রাধান্য পাচ্ছে বলে কোরিয়ান কোচ গাস হিডিঙ্ককে অভিযোগ করতে শোনা যায়। বিশ্বের অনেক দেশের জনপ্রিয় এই বেসবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

কলকাতায় নতুন খেলা বেসবল

কলকাতায় স্যাটেলাইট বেসবল দল



'স্যাটেলাইট স্পোর্টস'-এর সহযোগিতায় এখন শহর কলকাতার নতুন খেলা।

খুব বেশিদিন নয়, বছরতিনেক আগে কলকাতা শহরে গড়ে ওঠে রাজ্য বেসবল অ্যাসোসিয়েশন। যাঁর প্রচেষ্টায় এই সংস্থার জন্ম, সেই জহর দাসের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি জানালেন, "রাজ্য সংস্থা গড়ে তোলার পর কীভাবে এই খেলাটাকে জনপ্রিয় করে তোলা যায় সে-বিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছি, ঠিক তখনই সহযোগী হিসেবে পাশে পেয়ে যাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইট স্পোর্টস সংস্থাকে। এঁদের উদ্দেশ্য, সারা বিশ্বে বেসবলের প্রচার এবং প্রসার ঘটানো। এই রাজ্যসহ সারা দেশে বেসবলকে জনপ্রিয় করে তুলতে সংস্থাটি বিনা শর্তে খেলোয়াড়, কোচ, আম্পায়ার তৈরি এবং ক্রীড়া সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে আসে।" স্যাটেলাইট স্পোর্টসের প্রধান ফ্লোরিডার প্রাক্তন বেসবল খেলোয়াড় জন হেরমা নিজে এসে বাংলার বেসবল খেলোয়াড়দের তালিম দেন। বিভিন্ন স্কুলের ক্রীড়া প্রশিক্ষককে ডেকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গত সেপ্টেম্বরে দেশ থেকে এনে কলকাতার ১৬টি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাট, বল, গ্লাভ্‌স, প্যাড, হেলমেট মিলিয়ে স্কুল-প্রতি প্রায় ১০ হাজার টাকার ক্রীড়া-সরঞ্জাম বিনামূল্যে বিতরণ করে এই সংস্থা। এর পর কলকাতা সফরে এসেছিল স্যাটেলাইট বেসবল দল। এঁদের উদ্যোগেই সাইতে বসেছিল আন্তঃ-স্কুল বেসবল প্রতিযোগিতা। বিড়লা হাই স্কুলের ছাত্ররা চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রফি জিতে নেয়। রানার্স হয় সেন্ট জেম্‌স স্কুল। প্রতিযোগিতার উত্তাপ নিতে কলকাতার বাসিন্দা বহু মার্কিনি মাঠে ভিড় জমিয়েছিলেন। প্রতিযোগীদের মধ্যে এই নতুন খেলাটিকে ঘিরে উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

কেমন করে খেলে বেসবল? ক্রিকেটের মতো এই খেলাতেও মাঠে ব্যাট্‌সম্যান, বোলার, উইকেটকিপার এবং ফিল্ডাররা থাকেন। তবে ব্যাট্‌সম্যানকে এখানে ব্যাটার, বোলারকে পিচার এবং কিপারকে ক্যাচার বলা হয়। প্রতি দলে ন'জন খেলোয়াড় থাকেন। ন' ইনিংসের খেলা। তিনজন আউট হলেই এক ইনিংস শেষ হয়। ডায়মন্ড আকৃতির মাঠে খেলা হয়। মাঠের ইনফিল্ড এবং আউটফিল্ড এই দুটি ভাগের ইনফিল্ডে ১৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ১৮ ইঞ্চি চওড়া শক্ত রবারের চারটে বেস সমদূরত্বে কোনাকুনিভাবে পাতা থাকে। একটি বেস থেকে আর একটি বেসের দূরত্ব ৯০ ফুট। ব্যাটার যেখানে দাঁড়ান, সেই হোম বেস থেকে বাউন্ডারির দূরত্ব কমপক্ষে ৩৮০ ফুট, আর পিচ পয়েন্টের দূরত্ব ৬০.৬ ফুট হয়। ফিল্ডাররা ফার্স্ট বেস, সেকেন্ড বেস, থার্ড বেস, রাইট ফিল্ড, লেফ্‌ট ফিল্ড ইত্যাদি জায়গায় ফিল্ডিং করেন। ফিল্ডাররা যে হাতে বল ছোড়েন, তার বিপরীত হাতে গ্লাভ্‌স পরেন। ক্রিকেটের চেয়ে বড় বলে খেলা হয়। ব্যাটের আকৃতি ক্রিকেটের তুলনায় একেবারেই আলাদা। অনেকটা মুগুরের মতো দেখতে। হোম বেসে দাঁড়িয়ে বল মারার পর ব্যাট ছেড়ে হোম বেস থেকে ফার্স্ট, সেকেন্ড ও থার্ড বেস ঘুরে হোম বেসে ফিরে আসতে পারলে এক রান পাওয়া যায়। একজন ব্যাটার যখন ব্যাট করেন, তখন অন্য বেসে দাঁড়ানো ব্যাটাররা রানারের ভূমিকা পালন করেন। ক্রিকেটে ছয় বা ওভার বাউন্ডারির মতো বেসবলে হোমরান করা যায়। অবশ্য এখানে ছয় নয়, মাত্র এক রান পাওয়া যায়। তবে ওই সময় ব্যাটাররা বেস বদল করে সর্বোচ্চ চার রান পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারেন। একজন ব্যাটার তিনবার বল মারতে ব্যর্থ হলে আম্পায়ার তাঁকে স্ট্রাইক আউট ঘোষণা করেন। ফিল্ডাররা সরাসরি ক্যাচ ধরলেও ব্যাটার আউট হন। বল মারার পর দৌড়ে বেসে পৌঁছনোর আগে ইনফিল্ডের ফিল্ডারের হাতে বল চলে এলেও ব্যাটার আউট হয়ে যান। যে দল বেশি রান করে, সেই দল জয়ী হয়।



অল্প সময়ে এই বেসবলে বাংলার খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে যথেষ্ট আশাবাদী স্যাটেলাইট স্পোর্টসের কর্তারা। বেসবলকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব নিয়ে এই সংস্থার ক্রেগ হ্যারিস পরিবার নিয়ে কলকাতায় হাজির। বিদেশি কোচদের কাছ থেকে খেলাটা রপ্ত করে এখন ছোটদের বেসবল শেখাচ্ছেন কলকাতার সন্তোষ পাণ্ডে, মহম্মদ জাভেদ চৌধুরিরা। সন্তোষ জানালেন, "যারা ক্রিকেট জানে তাদের পক্ষে খেলাটা দ্রুত আয়ত্তে আনা সহজ। খুবই গতিময় খেলা। মাত্র তিন ঘণ্টায় খেলা শেষ। বেরি বন্ডস নিউ ইয়র্ক ইয়ানকি দলের খেলোয়াড়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় এই খেলোয়াড়টির বার্ষিক আয় ২০ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আয়ের এই বেসবল খেলোয়াড়টি হোমরানে বিশ্বখ্যাত। বন্ডসের কাছাকাছি আয় র‍্যান্ডি জনসনের। র‍্যান্ডি আবার পিচিংয়ে বিখ্যাত। সচিন, সৌরভরা এমন আয় কল্পনাই করতে পারবেন না।"

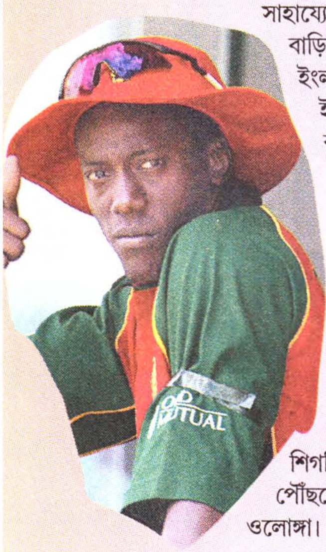
রাজ্য সংস্থা চায়, এবার জেলায় জেলায় বেসবলকে পৌঁছে দিতে। অন্য রাজ্যেও দল নিয়ে সফরে যাবে রাজ্য সংস্থা। সচিব জহরবাবুর মতে,"স্পনসর পেলে অচিরেই ক্রিকেটের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাবে বেসবল।"

আন্তঃস্কুল বেসবলে চ্যাম্পিয়ন বিড়লা হাই স্কুল

ফ্রিস্টাইল

ওলোঙ্গার নতুন জীবন

★ওলোঙ্গা। ইংল্যান্ডে নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ এসেছে তাঁর কাছে। জিম্বাবোয়ের এই মিডিয়াম পেসার ২০০৩ বিশ্বকাপে তাঁর দেশের রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবে-র একনায়কতন্ত্রের প্রতিবাদ করে তোপের মুখে পড়েছিলেন। ক্রিকেট খেলা ছাড়তে হয়েছে, এমনকী বিশ্বকাপের শেষে দেশে ফেরাও হয়নি তাঁর। এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ব্রিটিশ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেখানে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। সংবাদ-মাধ্যম জানিয়েছে, খুব শিগগিরই লন্ডনে পৌঁছচ্ছেন ওলোঙ্গা।



কুক্‌স পেরোলেন বুলা



★সেকথা আবার প্রমাণ করলেন বুলা চৌধুরী। নিউজিল্যান্ডের কুক্‌স প্রণালী জয় করে কিছুদিন হল দেশে ফিরেছেন তিনি। কুক্‌স জয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর সাতটি চ্যানেলের মধ্যে ছ'টি অতিক্রম করা হয়ে গেল তাঁর। তিনবছর ধরেই কুক্‌স পেরনোর চেষ্টা করছিলেন, আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য হয়ে উঠছিল না। ভারতের মধ্যে তৃতীয় এবং পৃথিবীতে ৫৫তম হিসেবে কুক্‌স পেরিয়েছেন বুলা। এখন তাঁর সামনে শুধু পক প্রণালী। এটি পেরোতে পারলেই সাতটি চ্যানেল জয়ের বিরল নজির গড়ার কৃতিত্ব বুলার দখলে আসবে।

ফোটো: অমিত দত্ত

হাউ'জ দ্যাট

★ স্টাম্প ছিটকে গেল রাহুল দ্রাবিড়ের। তাঁকে যিনি বোল্ড করেছেন তাঁর নাম বিজেতা পেন্ধারকর। না, কোনও মিক্সড ক্রিকেট ম্যাচের কথা হচ্ছে না। রাহুল আসলে হারাতে চলেছেন ভারতের 'মোস্ট এলিজিব্‌ল ব্যাচেলর' তকমাটা। সচিন তেণ্ডুলকরের স্ত্রী অঞ্জলির মতো নাগপুরের মেয়ে বিজেতাও পেশায় ডাক্তার। সামনের মে মাসে বিয়ে হবে রাহুল-বিজেতার। নিরাপত্তার কারণে নাগপুরের বদলে বাঙ্গালোরে বিয়ের অনুষ্ঠান হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিজেতার পরিবারের লোকজন। অন্যদিকে সুনীল গাওস্করের ছেলে রোহনেরও বিয়ে হল তাঁর স্কুলজীবনের বান্ধবী স্বাতী মাঁকড়-এর সঙ্গে।



ডেভিস কাপ প্লে অফ স্টেজে ভারত

★মাঠে নিউজিল্যান্ডকে ৪-১ সেটে উড়িয়ে দিয়ে আবার একবার ভাগ্য পরীক্ষায় নামার সুযোগ পাচ্ছে রমেশ কৃষ্ণানের দল। তবে ভারতের পক্ষে নিউজিল্যান্ডকে হারানো খুব একটা সহজ হয়নি। প্রথম দিন লিয়েন্ডার পেজ মার্ক নিয়েলসেনকে ৬-১, ৭-৬ (৭-১), ৬-২ সেটে হারানোর পর ওই দিনই অ্যালিস্টেয়ার হান্ট ও রোহন বোপান্নার মধ্যে দ্বিতীয় খেলাটি বৃষ্টির জন্য হতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন হান্টের কাছে হারতে হয় বোপান্নাকে। কিন্তু তৃতীয় দিন শর্টলকে ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ সেটে হারিয়ে ভারতকে ওয়ার্ল্ড গ্রুপ প্লে অফে তুলে আগের দিনের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে পেলেন বোপান্না। বোপান্না-শর্টলের খেলাটি ছাড়াও তৃতীয় দিনে ডেভিস কাপের আরও দুটি খেলা হয়েছে। ডাব্‌লস ম্যাচে লিয়েন্ডার পেজ এবং মহেশ ভূপতির জুটি ৮৫ মিনিটের মধ্যে হান্ট- নিয়েলসেনের জুটিকে ৬-৩, ৬-২, ৬-২ সেটে শেষ করে দেন। শেষ সিঙ্গলসে চেনেকে লিয়েন্ডার একঘণ্টারও কম সময়ে হারিয়ে দেন। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে চতুর্থবার ডেভিস কাপের প্লে অফ রাউন্ডে উঠল ভারত। আগের তিনবারই তিনটি মহাশক্তিধর দেশের কাছে হেরে ফিরতে হয়েছিল ভারতকে। ২০০০ সালে সুইডেন, ২০০১-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ২০০২-এ অস্ট্রেলিয়া রীতিমত নাকানিচোবানি খাইয়েছে ভারতীয় টেনিস-তারকাদের। অতীতের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আশাবাদী রমেশ কৃষ্ণান। আশার কারণটাও পরিষ্কার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড অথবা চেক রিপাবলিকের বিরুদ্ধে খেলায় ড্র করতে পারলেই ভারত হোস্ট নেশন হবে। আর সেক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনাও হাজার গুণ বেড়ে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সঙ্গের ছবিতে রোহন বোপান্না।



মনীষা দাশগুপ্ত

ফোটো: এ পি, এ এফ পি

কী আশ্চর্য!

মাছের সেলুন

★নাপিত মাছ বা 'বার্বার ফিশ' সমুদ্রের নীচে সামুদ্রিক উদ্ভিদ অথবা স্পঞ্জের উপর সেলুন খুলে বসে। খদ্দের অবশ্য সামুদ্রিক মাছ। এদের গায়ের রং এত উজ্জ্বল যে, বড় বড় মাছেরা দূর থেকেই বুঝতে পারে সেলুন আর নাপিত কোথায় বসে আছে। ব্যস, দৌড় লাগায় সেই সেলুনের দিকে। বড় বড় মাছের গায়ে, বিশেষ করে তাদের কানকো আর ফুলকোর মধ্যে, রোজই ময়লা জমে। সেখানে শ্যাওলা, ক্ষতিকর জীবাণু তৈরি হয়। সেগুলো পরিষ্কার না করলেই নয়। বড় বড় মাছ সেলুনে এসেই দম নেয়। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন নাপিত মাছ ফুলকোর ভিতরে ঢুকে পরিষ্কার করতে শুরু করে যাবতীয় ময়লা আর জীবাণু। এক পাশের ফুলকো পরিষ্কার হয়ে গেলে বড় মাছটি নিজে নিজেই পাশ ফিরে দাঁড়ায়। অনেক সময় খদ্দের বেশি হলে বড় বড় মাছ শান্তভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

ফ্লোরিডার উপকূলে একটা খাঁড়ির ভিতর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ব্যাপারটা। তাঁরা আরও দেখেছেন, যেসব বড় মাছ চট করে খাঁড়ির মধ্যে আসতে চায় না, তারাও চলে আসে খাঁড়িতে। সেলুনে না এলে যে বাঁচন-মরণ সমস্যা!

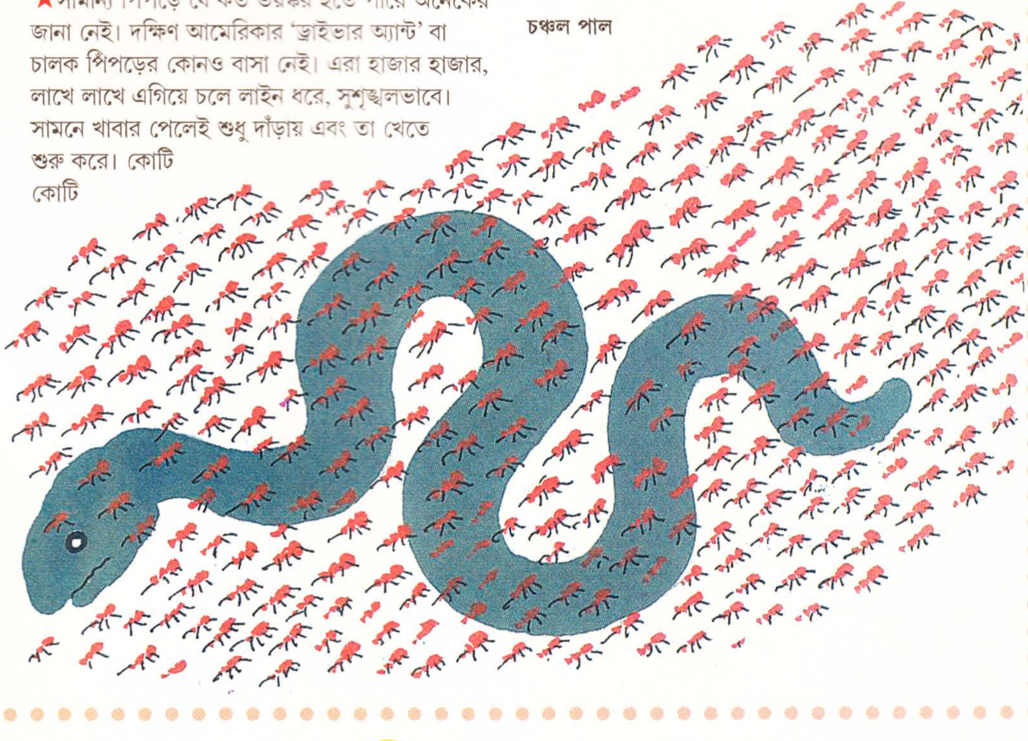
ভয়ঙ্কর পিঁপড়ে

★সামান্য পিঁপড়ে যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে অনেকের জানা নেই। দক্ষিণ আমেরিকার 'ড্রাইভার অ্যান্ট' বা চালক পিঁপড়ের কোনও বাসা নেই। এরা হাজার হাজার, লাখে লাখে এগিয়ে চলে লাইন ধরে, সুশৃঙ্খলভাবে। সামনে খাবার পেলেই শুধু দাঁড়ায় এবং তা খেতে শুরু করে। কোটি কোটি পিঁপড়ে দল বেঁধে বড় বড় প্রাণীকে খেয়ে নেয়। সামনে মানুষ, কীটপতঙ্গ বা জন্তু-জানোয়ার পড়লে তাদের মুক্তি নেই। তারা চট করে ছুটে পালাতে পারে না। একবার একটা বিরাট ময়াল সাপ শুয়ে ছিল নিকারাগুয়ার জঙ্গলে। চালক পিঁপড়ের দল অজগরটাকে নড়াচড়ার কোনও সুযোগ দেয়নি। অতবড় একটা অজগর মুহূর্তে ড্রাইভার অ্যান্টের দখলে। প্রায়ই শোনা যায়, ওখানে বেঁধে রাখা গোরু, ছাগল, ঘোড়া এই পিঁপড়ের কবলে পড়ে শেষ হয়ে গেছে। তবে এই পিঁপড়েরা কিন্তু লোভী নয়। শিকারের গন্ধ পেয়ে ওরা সেদিকে ছোটে না, হাঁটতে হাঁটতে সামনে শিকার পেলে তবেই খায়। নয়তো উপবাস।

হিমবাহের দুরন্ত গতি

★হিমবাহ ঢালু পথে উপর থেকে নীচের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। এটাই তার স্বাভাবিক ধর্ম। তখন হিমবাহের গতি চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু ঢাল যদি একটু বেশি হয় তা হলে যে কী প্রচণ্ড গতিতে সে ছুটে আসতে পারে, তা কল্পনারও বাইরে। কয়েক মাইল লম্বা-চওড়া হিমবাহ তার বিশাল বপু নিয়ে এগিয়ে আসছিল সুইজারল্যান্ডের গ্লারনিচ পাহাড়ের উপর। ১৮৯৮ সালের ৬ মার্চ তার পথ এত ঢালু হয়ে পড়ল যে, পুরো হিমবাহটা আর টাল সামলাতে পারল না। কারণ, অনুভূমিক রেখার সঙ্গে ৪৪ ডিগ্রি কোণ করে হেলে পড়েছিল। এবার শুরু হল তার দুর্দান্ত গতিতে নামার পালা। গড় গতি হল ঘণ্টায় ২১৭ মাইল বা ৩৪৯ কিলোমিটার। ভাবা যায়!

চঞ্চল পাল



ছবি: দেবাশিস দেব

বাগদাদের পতন

◆◆এখনও বিক্ষিপ্ত কিছু লড়াই, চোরাগোপ্তা প্রতিরোধ চললেও কার্যত শেষ ইরাকের যুদ্ধ। বাগদাদ শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, বিমানবন্দর, প্রশাসনিক ভবন জোটসেনার দখলে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে মার্কিন ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনী। যুদ্ধের শুরুতে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রাম্‌সফেল্ড জানিয়েছিলেন, বাগদাদ দখল যৌথবাহিনীর পক্ষে 'কেকওয়াক'-এর চেয়ে বেশি কঠিন কিছু হবে না। কিন্তু ২১ দিনের যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর ধারণা নিতান্তই ভুল ছিল। দক্ষিণ ইরাকের বসরা, নাজাফ, নাসিরিয়া প্রভৃতি শহরে তীব্র প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে ব্রিটিশ-মার্কিন জোটসেনাকে। কারবালা, আল কুট, মসুল প্রভৃতি শহরেও প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। দক্ষিণ ইরাকের পাশাপাশি উত্তরেও রণাঙ্গন খুলতে হয়েছে জোটশক্তিকে। তিনদিক দিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করার পথে শহরের উপকণ্ঠে কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সাদ্দাম হুসেনের অনুগত রিপাবলিকান আর্মি। অ্যাব্রাম্‌স ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি আর বোমারু বিমানবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে সেই প্রতিরোধ ভেঙে বাগদাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলির উপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে সেগুলির অধিকাংশই দখল করে নিয়েছে মার্কিন সেনারা। সেই আক্রমণে কার্যত গুঁড়িয়ে গিয়েছে ইরাকি প্রতিরোধ। বোমা ফেলা হয়েছে সাদ্দামের একাধিক প্রাসাদেও। বাগদাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই শহর জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে ব্যাপক লুটতরাজ ও নৈরাজ্য। একই ঘটনা ঘটেছে বসরা, নাজাফেও। এরই মধ্যে ইরাকিদের মন পাওয়ার চেষ্টায় কসুর করেনি জোটসেনারা। কিন্তু তাদের ত্রাণবন্টন নিয়েও উঠেছে প্রচুর অভিযোগ। যুদ্ধে উভয় বাহিনীরই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। মার্কিন বাহিনীর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী কেবল বাগদাদ শহরেই মারা গেছে প্রায় আড়াই হাজার ইরাকি সেনা। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে জোটসেনারও। যুদ্ধে দেড়শোরও বেশি ব্রিটিশ-মার্কিন সেনা মারা গিয়েছে। সাধারণ মানুষ কত মারা গিয়েছে তার কোনও পূর্ণাঙ্গ হিসেব এখনও পাওয়া যায়নি।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ও প্রতিবাদের মধ্যেই শুরু হয়েছে যুদ্ধোত্তর ইরাকের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য, সেখানেও মার্কিন প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছেন জর্জ ডব্লিউ বুশ। যুদ্ধোত্তর ইরাকের পুনর্গঠনে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকা কী হবে, তা নিয়েও বিতর্ক অব্যাহত।

অভীক ভট্টাচার্য

ভ্যাট চালু ১ জুন থেকে

◆◆পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের ১৫টি রাজ্যে ভ্যাট বা যুক্তমূল্য কর চালু হবে জুন মাসের মধ্যেই। এ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁর মতে, এই চুক্তি চালু হলে কর ফাঁকি দেওয়া কমবে এবং শিল্পপতিদের সুবিধা হবে। সরকারের এই ভূমিকার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। ওষুধ ব্যবসায়ীরা দেশ জুড়ে বন্‌ধ পালন করেছেন পর পর দু'বার, অন্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছোট ব্যবসায়ীরাও অসন্তুষ্ট। তবে, আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে ব্যাপকভাবে এই কর চালু হওয়ার সম্ভাবনা কম।

পঞ্চায়েত নিবার্চন

◆◆এই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে আগামী মে মাসে। প্রার্থী নির্বাচনের সময় যাতে কোনওরকম গাফিলতি না করা হয়, সেই মর্মে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সি পি এমের কর্তারা। রাজ্যের ১৭টি জেলায় প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ সেরে ফেলেছেন তাঁরা। অন্য প্রধান দলগুলির তরফেও প্রচার শুরু হয়ে গেছে।

রুদ্রাণী ভট্টাচার্য





✻ চিরাচরিত শহুরে জীবন একঘেয়ে লাগছে? পাহাড়, সমুদ্র বা জঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ার কোনও সুযোগ নেই? তা হলে আপনার ঠিকানা হতে পারে নিক্কো পার্ক। যাঁরা থ্রিল ভালবাসেন, তাঁদের জন্য নিক্কো পার্কে চালু হয়েছে একটি নতুন রোলার কোস্টার রাইড, 'দ্য সাইক্লোন'। সিমুথ্রিলার, টাইটানিক, থ্রিলেনিয়াম-এর পর নিক্কো পার্কের থ্রিল-রাইডের তালিকায় এটি চতুর্থ সংযোজন। ইংল্যান্ডের মেসার্স ব্ল্যাকপুল লিজার অ্যান্ড অ্যামিউজমেন্ট কনসালট্যান্সি লিমিটেডের টেকনিক্যাল সহায়তায় তৈরি হয়েছে ভারতের বৃহত্তম রোলার কোস্টারটি। অন্যান্য রোলার কোস্টারের সঙ্গে এর তফাত হল, এটি তৈরি হয়েছে কাঠ দিয়ে। ৬৬০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই রাইডে প্রায় ৭৫০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে মাত্র দু' মিনিটে। রাইডটির জন্য খরচ হয়েছে প্রায় তিন কোটি টাকা। সাতটি আপ ও সাতটি ডাউন মুভমেন্টের রোলার কোস্টারটি ৫৫ ফুট উপরে উঠতে পারে। একসঙ্গে ১৮ জন যাত্রী এই রাইডের আনন্দ নিতে পারেন। টিকিটের দাম মাথাপিছু মাত্র ৪০ টাকা।

মনীষা দাশগুপ্ত

নতুন চেহারায় পুরনো কফি হাউস

✻ সারা শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের কফি বার। এখানে হালকা সুরে পশ্চিমি গান বাজে, এয়ারকন্ডিশনড ঘরে নানারকম দেশি-বিদেশি কফির পাশাপাশি থরে থরে সাজানো থাকে কেক-পেস্ট্রি-প্যাটিস-বার্গার। এসবের মাঝে আবার ফিরে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম কফি হাউস, কলকাতাসহ সারা রাজ্যের নতুন নতুন জায়গায় খুলছে তাদের শাখা। এ কথা ঠিক, সময় যতই বদলাক, বাঙালির কাছে আড্ডার কদর কমবে না কখনওই। আর সেটা জমাতে জুড়ি নেই কফি হাউসের ইনফর্মাল আবহের। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে মেডিক্যাল কলেজে খুলেছে কফি হাউস ক্যান্টিন, একটি শুধু ডাক্তারদের জন্য, অন্যটি কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং উৎসাহী সকলের জন্য।



খাবারের তালিকাতেও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে কফি হাউস। ইনচার্জ জাহিদ হোসেন জানিয়েছেন, "এখন চা পাওয়া যাচ্ছে এখানে।" কফি হাউসে যে খাবারগুলো পাওয়া যেত, সেগুলো পাওয়া যাবে তো? "নিশ্চয়ই। কফি হাউসের বেশ কয়েকজন কুক রান্না করবেন এখানে। মজার ব্যাপার, অ্যালবার্ট হলের তুলনায় এখানে খাবারের দাম বেশ কম।" কিছুদিনের মধ্যেই সল্টলেক এবং নন্দনে পৌঁছে যাবে কফি হাউস।

ঈপ্সিতা বসু

ততদূরই যেতে পারো

অসাধারণ হওয়ার রহস্য মস্তিষ্কে নয়, লুকিয়ে আছে তোমার মনে। প্রশ্ন হল, নিজেকে তুমি কী চোখে দেখছ? আলোচনা করেছেন

রয় চৌধুরী

ইংরেজিতে একটা কথা প্রায়ই বলা হয়, 'দ্য মি আই সি, দ্য মি আই উইল বি'। কথাটা শুনতে একটু হেঁয়ালির মতো, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, কথাটা কতখানি সত্যি। কীভাবে, একটু দেখা যাক। রূপকথার গল্পে এমন আয়নার কথা আমরা পড়েছি আমরা, যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি প্রশ্ন করো, "বলো তো, আমার মধ্যে এমন কী আছে যা আর কারও মধ্যে নেই?" আয়না সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে তোমার মধ্যে কী প্রতিভা লুকিয়ে আছে। হ্যারি পটারের গল্পের সেই জাদু টুপির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের। হগওয়ার্টসে নতুন ছেলেমেয়েরা পড়তে এলে কে কোন হস্টেলে থাকবে তা জানিয়ে দিত সেই জাদু টুপি। কোনও ছাত্র তা মাথায় পরলেই টুপি তাদের স্বভাব নির্ভুলভাবে বুঝে নিয়ে বলে দিত, কে কোন হস্টেলে থাকার উপযুক্ত।



এমন একটা আয়না বা টুপি আমাদের হাতে থাকলে তো কোনও সমস্যাই ছিল না। স্কুল-কলেজের পড়া শেষ করে কে কোন দিকে যাব, জীবনে কে কতটা উচ্চতায় পৌঁছব, নিমেষে ফয়সালা করে নেওয়া যেত। কিন্তু তা তো আর হওয়ার নয়। তাই নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হয় নিজেদের ভবিষ্যৎ।



আর এখানেই ঘটে যত বিপত্তি। কীভাবে আমরা বুঝব, আমরা কেমন? সমস্যা হচ্ছে, বিষয়টাকে সচরাচর আমরা দেখতে চাই একেবারে ভুল জায়গা থেকে। আমরা দেখতে চাই, অমুকটা আমরা হতে পারব কিনা। কখনও ভাবি না, আমরা নিজেদের কোন জায়গায় দেখতে চাই। আমরা কে কেমন, সে বিষয়ে তো প্রত্যেকেরই মোটামুটি একটা ধারণা আছে, তাই না? কিন্তু ক'জন জানি, আমরা কী হতে পারি? সত্যি কথা বলতে কী, খুব কম মানুষই নিজের ক্ষমতা বিষয়ে সচেতন থাকেন। আর এই সচেতনতা থাকে না বলেই হয় সমস্যা। আমরা যা হওয়ার ক্ষমতা রাখি, তা কখনওই হয়ে উঠতে পারি না। ভুলে যাই, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে অসাধারণ হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয় রসদ। মনে রাখি না, সেই রসদের যথার্থ ব্যবহারই সাফল্য এনে দিতে পারে আমাদের।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, একজন মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় একশো কোটি কোষ থাকে। আট বছর বয়সেই আমাদের মস্তিষ্কে এই বিপুল সংখ্যক কোষ তৈরি হয়ে যায়। একজন সাধারণ মানুষ তাঁর মস্তিষ্কের মাত্র ১০ শতাংশ ব্যবহার করেন সারা জীবনে। বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। হিসেব করে দেখা গেছে, একজন মানুষ দিনে গড়ে ৬০ হাজারটি বিষয়ে চিন্তা করে থাকে। অথচ একটি মানবমস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা হল দিনে প্রায় আট কোটি ৫০ লক্ষ তথ্য। অর্থাৎ মানুষ যদি নিজেদের মস্তিষ্কের ব্যবহার বাড়াতে পারে, তা হলে প্রত্যেকেই পৌঁছতে পারে এমন এক উচ্চতায়, যা তার নিজের পক্ষেই বিস্ময়কর।

তারাই 'এক্সট্রাঅর্ডিনারি', যারা 'অর্ডিনারি'দের তুলনায় 'এক্সট্রা' কিছু করেন। একজন চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট কিন্তু সাধারণ মানুষের তুলনায় দশগুণ জোরে ছোটেন না। সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁরা বড়জোর সেকেন্ডের কয়েক ভগ্নাংশ জোরে দৌড়োন। কিন্তু সেই সামান্য 'এক্সট্রা পারফরম্যান্স'ই তাঁকে পৌঁছে দেয় অসাধারণত্বে। তার জন্য চাই দুটো জিনিস। প্রথমত, তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, তুমি অসাধারণ হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখো। আর দ্বিতীয়ত, সেই উচ্চতায় পৌঁছবার জন্য তুমি আর পাঁচজনের চেয়ে বাড়তি কিছু করতে রাজি থাকো, যাকে কাউন্সিলাররা বলেন, 'টু বি রেডি টু ওয়াক অ্যান এক্সট্রা মাইল'।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল মহম্মদ আলির বিখ্যাত একটি উক্তি। আলিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "অবসর সময়ে আপনি কী করেন?" আলি বলেছিলেন, "অবসর মুহূর্তে আমি ভাবি রিংয়ে যে আমার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সে এখন কী করছে? যদি মনে হয় সে এখন প্র্যাকটিস করছে তা হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে শুরু করি, কারণ তা না হলে তো আমি পিছিয়ে পড়ব। আর যদি মনে হয় সে এখন বিশ্রাম করছে তা হলে আমি দ্বিগুণ উদ্যমে প্র্যাকটিস করতে শুরু করি, কারণ এটাই আমার ওকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সময়।" কথাটার মধ্যে যে মেসেজটা আছে, সেটা



যতদূর তুমি যেতে চাও



একটু খেয়াল করে দেখলেই বুঝতে পারবে, 'টু বি রেডি টু ওয়াক অ্যান এক্সট্রা মাইল' কথাটার সত্যিকারের তাৎপর্য কী।

এই জায়গাটাতেই আমার-তোমার সঙ্গে একজন জিনিয়াসের পার্থক্য। ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল, আইনস্টাইন মারা যাওয়ার পরে তাঁর মস্তিষ্কটিকে বের করে নেওয়া হয়েছিল গবেষণার জন্য। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত প্যাথোলজিস্ট ড. টমাস হার্ভে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মিলে আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দেখবেন তাঁর অসাধারণত্বের রহস্য। পরীক্ষার ফলও ঘোষিত হয়েছিল যথাসময়ে। দেখা গিয়েছিল, আইনস্টাইনের মস্তিষ্ক হুবহু আর পাঁচজন মানুষের মস্তিষ্কের মতোই।

অর্থাৎ, অসাধারণ হওয়ার রহস্য মস্তিষ্কে নয়, লুকিয়ে আছে তোমার মনে। প্রশ্ন হল, নিজেকে তুমি কী চোখে দেখছ? মনে রেখো, আমরা কেউই সাধারণ হওয়ার জন্য জন্মাইনি। নিজেদের সাধারণ বলে ভাবতে শিখেছি বলেই আমরা সাধারণ। যিনি নিজেকে অসাধারণ বলে ভাবতে পারেন, তিনিই অসাধারণ হতে পারেন। এবার বুঝতে পারছ তো, 'দ্য মি আই সি, দ্য মি আই উইল বি' কথাটির তাৎপর্য'?



আর ঠিক এখান থেকেই তৈরি হয় পরবর্তী প্রশ্নটি। তুমি কি জানো তুমি কোথায় যেতে চাও? নিজেকে সফল দেখতে চাওয়ার জন্য এই প্রশ্নটির স্ফটিকস্বচ্ছ জবাব অবশ্যই থাকা দরকার তোমার হাতে। তুমি সঠিক রাস্তায় যাচ্ছ কিনা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল তুমি কোথায় যেতে চাও সেটা জানো কিনা। দেখা যায়, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই জীবনের স্রোতে ভেসে যতদূর পৌঁছয়, ততটুকুতেই তারা সন্তুষ্ট, কারণ তাদের জীবনের সুনির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য নেই। মনে রেখো, তুমি কোথায় ছিলে বা এখন কোথায় আছ সেটা বড় কথা নয়, তুমি কোথায় যেতে চাও সেটাই আসল। তুমি কি তোমার গন্তব্য নির্দিষ্ট করতে পেরেছ? তুমি কি ঠিক করে নিতে পেরেছ তুমি কোথায় পৌঁছতে চাও? যদি উত্তর হয় 'হ্যাঁ', তা হলে তুমি একেবারে ঠিক পথে আছ। আর যদি উত্তর হয় 'না', তা হলে আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে এই মুহূর্তে ঠিক করে ফেলো তোমার লক্ষ্য। মানুষ যা পেতে চায় অবশ্যই পেতে পারে, যদি সে তার লক্ষ্যের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেয়। লক্ষ্যের প্রতি যদি মনোযোগী হও, দেখবে লক্ষ্যপূরণের শক্তি আপনা থেকেই তোমার মধ্যে এসে যাবে।

তাই প্রথমেই স্থির করে নাও তোমার লক্ষ্য। মনস্থির করে নাও পরীক্ষায় কত শতাংশ নম্বর তুমি পেতে চাও। "পরীক্ষায় ভাল ফল করব"— এরকম নয়, তোমার লক্ষ্য হওয়া চাই আরও সুনির্দিষ্ট, যাকে বলে 'স্পেসিফিক'। নিজেকে বলো, "আগামী পরীক্ষায় ৮০% নম্বর আমায় পেতেই হবে।" এবার এই কথাটা বড় বড় করে কাগজে লিখে তোমার পড়ার টেবিলের সামনে দেওয়ালে লাগিয়ে রাখো, যাতে সবসময় তা তোমার চোখে পড়ে, তোমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। যতবার পারো কাগজটার দিকে তাকাও, মনে মনে, বা পারলে জোরে জোরেই, নিজেকে শোনাও কথাটা। এভাবে তোমার মস্তিষ্কে একটা প্রোগ্রামিং তৈরি হবে। তোমার ইচ্ছাশক্তি তোমায় সাফল্যের দিকে চালনা করতে শুরু করবে। চোখ রাখো লক্ষ্যের দিকে, সমস্যার দিকে নয়। মনে রেখো, দু'ধরনের মানুষ হয়। একদল কেবল সমস্যাগুলোকেই দেখে, তাদের বলে 'প্রবলেম-কনসার্নড'। সমস্যাগুলোর দিকেই কেবল তাকিয়ে থাকে বলে সমাধানের পথটা আর দেখা হয়ে ওঠে না তাদের। আর একদল মানুষ আছে যারা মনে করে সমস্যা থাকবেই, কিন্তু সমস্যার দিকে তাকিয়ে থাকলে সমাধান কখনওই পাওয়া যাবে না। তারা সব সময় সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। তাদের বলে 'সলিউশন-কনসার্নড'। মনে রেখো, সমাধান যারা খোঁজে তারাই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ পায়।আরও একটা কথা মনে রেখো। সবাই যে পথে চলে, সে পথে চলার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব নেই। চেষ্টা করো নিজের পথ নিজে তৈরি করতে। ব্যতিক্রমী মানুষই পারে দৃষ্টান্ত তৈরি করতে। আইনস্টাইন যা পেরেছিলেন, তুমি, তোমরা প্রত্যেকেই তা পারো। অবশ্য যদি তোমরা চাও।



ছবি: দেবাশিস দেব

খুনি দরওয়াজা পেরিয়ে

কোশকমহল

ঝাঁসি থেকে একশো কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের মাথায় অপূর্ব এক দুর্গের কথা জানাচ্ছেন **অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।**

চান্দেরি এখনও পর্যটকদের কাছে ব্রাত্য। অনেকে গোয়ালিয়র যান, গোয়ালিয়র থেকে শিবপুরি। যান শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে জাতীয় উদ্যানে। অথবা শিবপুরির পথে পড়ে সুলতানগড় ফল্‌স, তা-ও দেখেন। কিন্তু চান্দেরি? নৈব নৈব চ। শিবপুরি থকে ১২৭ কিলোমিটার দূরে চান্দেরি।

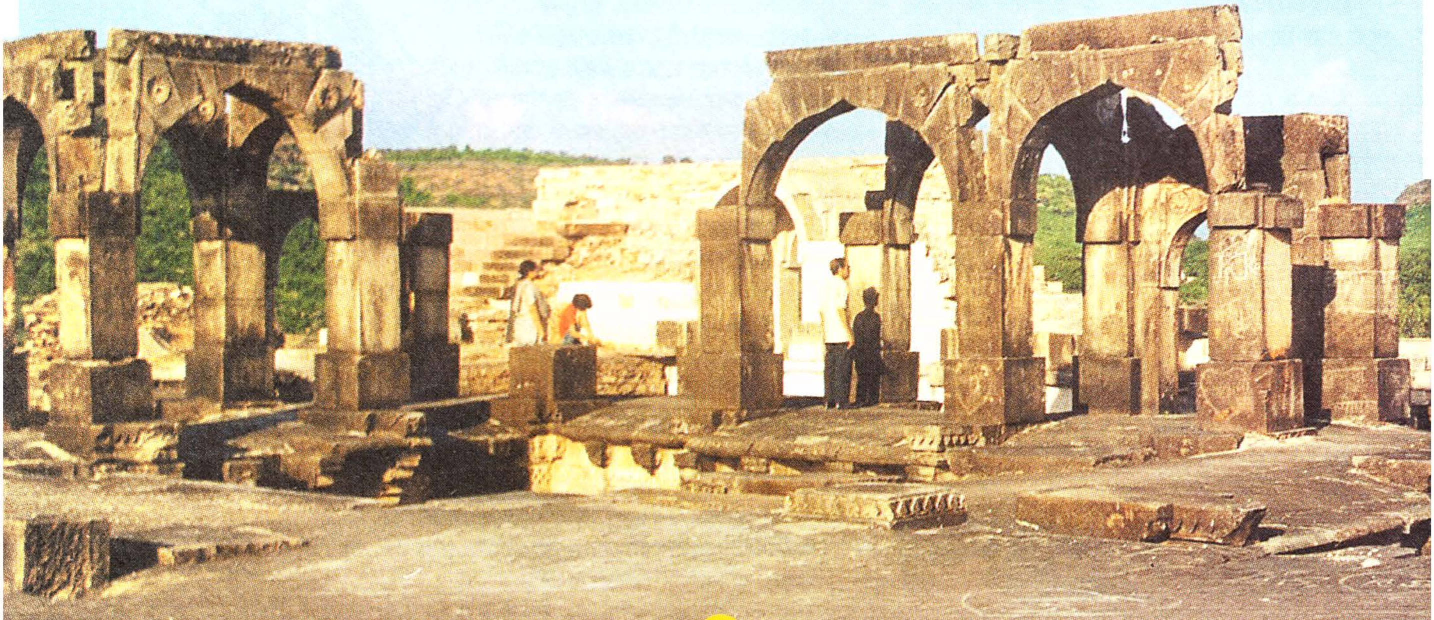
গুনা জেলার সুন্দর শহর চান্দেরির খ্যাতি তার বিশাল দুর্গের জন্য। ২০০ মিটার উঁচু পাহাড়ি টিলায় মুঘল আমলের তৈরি এই দুর্গের প্রধান তোরণের নাম 'খুনি দরওয়াজা'। মারাত্মক অপরাধীদের হত্যা করে এই তোরণের সামনে ঝুলিয়ে রাখা হত এক সময়। অনেকের মতে, এই তোরণের সামনেই অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হত। তাই 'খুনি' তকমা যোগ হয়েছে এই তোরণে। দুর্গের কাছেই সঙ্গীতশিল্পী বৈজু বাওরার একটি ছত্রি আছে। চান্দেরিতে শুধু মুঘল আমলেরই নয়, বুন্দেলা রাজপুত এবং মালওয়া সুলতানদেরও অনেক স্মারক ছড়িয়ে আছে।

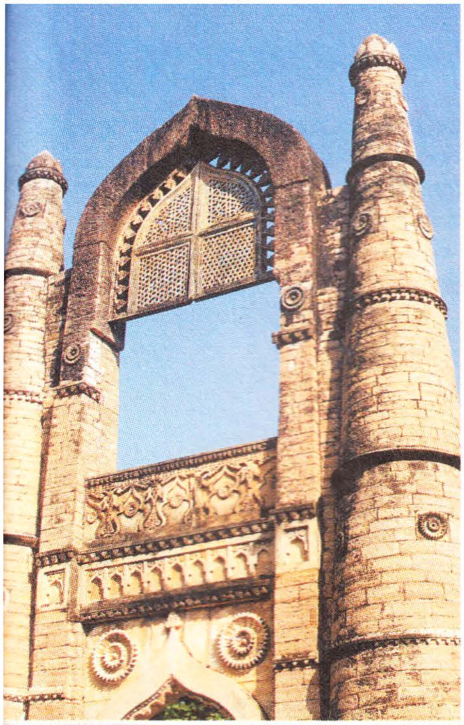
চান্দেরির অন্য আকর্ষণ 'কোশক-ই-হক- মঞ্জিল' বা কোশক মহল। ১৪৪৫ সালে মালওয়ারার সুলতান মাহমুদ দ্বিতীয় খিলজি চান্দেরি অতিক্রম করার সময় এই কোশক মহল তৈরির আদেশ দেন। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে মাত্র দুটি মাত্র তলা তৈরি হয়, কথা ছিল সাততলার। অপূর্ব, অসম্পূর্ণ প্রাসাদটি হলুদ পাথরের তৈরি, মাণ্ডুর স্থাপত্যের সঙ্গে মিল আছে। প্রাসাদটি চার ভাগে বিভক্ত।

কোনও এক যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসেবে গড়া 'বাদল মহল' তোরণটি স্থাপত্যের দিক থেকে খুবই সুন্দর। হলুদ পাথরের এই তোরণটির বৈশিষ্ট্য হল এটি কোনও প্রাসাদের সঙ্গে যুক্ত নয়। তোরণের সামনে রয়েছে পরিত্যক্ত একটি প্রাচীন কারাগার। তোরণের পিছনে, একটু দূরে, টিলার মাথায় দেখা যায় চান্দেরি দুর্গ।

চান্দেরির অন্যান্য দ্রষ্টব্য হল জামা মসজিদ। এক-পাথরের দরওয়াজা, 'শাহাজাদি-কা-রৌজা', 'বাত্তিশ বাভ্‌দি', 'পরমেশ্বরতল', এবং পুরনো বেশ কিছু জৈন মন্দির। পঞ্চদশ শতকের তৈরি জামা মসজিদের গম্বুজগুলি আজও অক্ষত। এই মসজিদের প্রধান ফটক থেকেই দেখা যায় পাহাড়ের মাথায় দুর্গটিকে। 'শাহাজাদি-কা রৌজা' নামের এই অট্টালিকায় জড়িয়ে

কোশকমহল







বাদলমহলের তোরণ

আছে এক রাজকন্যার লোকগল্প। চান্দেরির উত্তর-পশ্চিমে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রাজপুতদের তৈরি পরমেশ্বরতাল। এই হ্রদটিকে ঘিরে তিন রাজপুত রাজাদের তৈরি ছত্রি ও একটি সুন্দর মন্দির আছে। 'বুদ্ধি চান্দেরি' নামে খ্যাত পুরনো চান্দেরি শহরে নবম ও দশম শতকের তৈরি বেশ ক'টি জৈন মন্দিরকে ঘিরে উৎসব বসে প্রতি বছর। এখান থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে প্রাচীন থুবন গ্রামে যেতে পারেন, ভ্রমণের স্বাদ বদলের জন্য। অবশ্য পরবর্তীকালে চান্দেরির খ্যাতি রেশমি শাড়ি, মসলিন এবং ব্রোকেড শিল্পের জন্য। ঝাঁসি বা শিবপুরি থেকে একদিনেই ঘুরে আসা যেতে পারে চান্দেরি। ঝাঁসি থেকে চান্দেরির সড়কপথে পড়বে 'রানি লক্ষীবাঈ সাগর' নামে এক বিশাল জলাশয়। সামনে দাঁড়ালে দেখা যায় গোটা আকাশটাই রানি লক্ষীবাঈয়ের জলে ভাসছে।

চান্দেরি যাওয়া খুবই সহজ। আকাশপথে গোয়ালিয়রে নেমে সড়কপথে ২৩৯ কিলোমিটার চান্দেরি। আর ট্রেনে? দিল্লি-চেন্নাই রেলপথে ললিতপুরে নেমে ৩৭ কিলোমিটার দূরেই চান্দেরি। সড়কপথে মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বেশ কয়েকটি শহরের সঙ্গে যুক্ত চান্দেরি। এখানে থাকার জায়গা দু-চারটে আছে, তবে খুব ভাল নয়।

ফোটো: লেখক

'মনের খবর' বিভাগে চিঠি পাঠাতে হলে পুরো নাম এবং ঠিকানা লিখে পাঠাতে হবে। যারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, তাদের নাম গোপন রাখা হবে। নাম-ঠিকানা ছাড়া কোনও চিঠি বিবেচিত হবে না।

যে কোনও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে তোমাদের পাশে আছে 'আনন্দমেলা'। সমস্যা জানাও এই ঠিকানায়: রিমি সেন 'মনের খবর' 'আনন্দমেলা' ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ যোগাযোগ করা যেতে পারে ই-মেলেও: anandamela@abpmail.com

মনের খবর

উত্তর দিচ্ছেন রিমি সেন



▶▶আমি বি. এ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আমার দিদির বান্ধবীকে অনেকদিন ধরে আমি খুব পছন্দ করি, সে আমার থেকে ছ'বছরের বড়। ভয়ে ও লজ্জায় এতদিন মেয়েটিকে কিছু বলতে পারিনি। এখন একটি ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠছে, ছেলেটি ওর পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত। কিছুদিনের মধ্যে দুই বাড়ি থেকেই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আমার পক্ষে মেয়েটিকে ভোলা সম্ভব নয়। আমি কী করব?

হিজল দত্ত
কোচবিহার

●চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, তোমার বয়স মোটামুটি ২০-২১, এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে এখনও সময় লাগবে। মেয়েটি কি ততদিন অপেক্ষা করবে, বিশেষত যে তোমার চেয়ে অন্তত ছ'বছরের বড়? অবশ্য এসব কথা ভাবার আগে আরও ভাইট্যাল একটা প্রশ্ন আছে। মেয়েটি কি তোমাকে ভালবাসে? যা লিখেছ, তাতে তো মনে হচ্ছে তেমন কোনও ইঙ্গিত পাওনি কখনও। তা হলে ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভাবছ কেন? কাউকে খুব ভাল লাগলেই যে তাকে বিয়ে করতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আর মেয়েটির পক্ষে তার বন্ধু উপযুক্ত কিনা, সেটা ঠিক করার অধিকার একমাত্র তার নিজের এবং তার পরিবারের। তাদের পক্ষে কোনও বাধা না থাকলে তুমি ঝামেলা বাড়াতে যেও না। বাস্তব মধুর না হলেও মেনে নিতে হয় অনেকসময়, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

▶▶আমার নিজের বোন নেই বলে যত মেয়ের সঙ্গে মিশি, তাদের প্রত্যেককে বোন বলেই ভাবি। কিন্তু মেয়েরা আমাকে অনেকবার বিপদে ফেলেছে। অনেকবার ভেবেছি, আর কথা বলব না এদের সঙ্গে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি কখনওই। কোনও ভাল মেয়ে দেখলেই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। পড়াশোনায় মন বসাতে পারি না। কীভাবে নিজেকে শোধরাব? জানিয়ে দিই, আমি ক্লাস টেনে পড়ি, সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাঁকুড়া

●তুমি একবার বলেছ মেয়েদের বোনের মতো দ্যাখো, আবার খানিক পরেই লিখেছ, ভাল মেয়ে দেখলেই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। দুটো তো একেবারে আলাদা ব্যাপার। আর বুঝতে হবে, কোনও সম্পর্কে তুমি যা চাও, সেটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। যে মেয়েটিকে তুমি ভালবাসছ, সে কী চায় তা জেনে নিয়েছ? তার অপছন্দের কাজ যদি তুমি করে থাকো, তাহলে নিজের ক্ষতি নিজেই করছ। কোনও মেয়ে তোমার বিপদের কারণ হলে তাকে সোজাসুজি জানাও সে কথা। অজানা লোককে ভালবাসা যায় না, যে আকর্ষণটা হয় তাকে বলে ইনফ্যাচুয়েশন। এটা কাটিয়ে ওঠা যায় সহজেই। পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে খুব কাজ দেয় মেডিটেশন বা ধ্যান। প্রতিদিন সকালে মিনিট দশেক শিরদাঁড়া সোজা করে বোসো, চোখ বন্ধ করে মন থেকে সব চিন্তাভাবনা সরিয়ে দাও। যত বেশিক্ষণ এই ব্ল্যাঙ্ক ভাবটা বজায় রাখতে পারবে, তত ভাল। একটা পজিটিভ বিষয় হল যে তুমি নিজেই বুঝতে পারছ যা করছ সেটা ঠিক নয়, এটাই তোমাকে সাহায্য করবে স্বাভাবিক হতে।

▶▶আমি এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। পড়াশোনায় মোটামুটি। পাঁচ বছর বয়স থেকে ক্রিকেটই আমার ধ্যানজ্ঞান। ছেলেবেলায় বাড়ির কাছাকাছি কোচিং ক্যাম্পের শিক্ষক বলেছিলেন আমার মধ্যে প্রতিভা আছে। বাবা-মা শরীর সুস্থ রাখার জন্য খেলায় উৎসাহ দিতেন তখন। কিন্তু যেই বুঝলেন, ক্রিকেটটা আমি সিরিয়াসলি খেলছি এবং এটাকেই পেশা হিসেবে নিতে চাই, তখনই উৎসাহ দেওয়া কমিয়ে দিলেন। মাধ্যমিকের পর আর একদিনও আমি নষ্ট করতে চাই না। সফলভাবে ক্রিকেট খেলতে চাই। কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে মা-বাবা রাজি হচ্ছেন না। তাঁদের দুঃখ দিতে চাই না, কিন্তু স্বপ্নটাকেও ছাড়তে পারছি না।

কিংশুক
সোদপুর

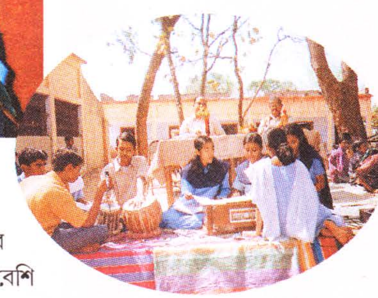
●তুমি যে গড্ডলিকা প্রবাহ থেকে বেরিয়ে এসে অন্যকিছু করতে চাইছ, তার প্রশংসা করছি। তবে অল্পবয়সের জেদ এর মধ্যে কতটা আছে, আর ঠাণ্ডা মাথার ভাবনাচিন্তা কতটা, সেটা বোঝা দরকার। প্রতিভা থাকলেই দেশের প্রতিনিধিত্ব করা যায় না। ভাগ্যের সাহায্য তো লাগেই, তা ছাড়াও অনেক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, লড়াই করে নিজের জায়গা তৈরি করতে হয়। কোনও কোনও সময় অনেক অন্যায়ের শিকারও হতে হয়। তোমার আত্মবিশ্বাস প্রশংসনীয়। মনে রেখো, খুব বেশি সুযোগ আসবে না জীবনে। প্রথমদিকেই নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। একশো কোটি মানুষের দেশে তোমার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিভাবান কেউ থাকতেই পারে। তাই নিজের যোগ্যতা ঠিক কতটা, সেটা প্রথম সুযোগেই জানিয়ে দাও সকলকে। একই সঙ্গে নিজের কাউন্সেলিং করো, নিজেকে বোঝাও, জাতীয় দলে সুযোগ না পেলেই তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে না। কোনও অবস্থাতেই পড়াশোনা ছেড়ো না, সামান্য ঢিলেমিও দিও না। যদি সফল ক্রিকেটার নাও হতে পারো, মোটামুটি স্বচ্ছন্দ একটা জীবনযাপন করতে গেলে কাজে লাগবে অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন। কুম্বলে আর শ্রীনাথ কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে ভাল ছাত্র ছিলেন। সুতরাং ক্রিকেট খেলতে হলে লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিতে হবে, সেটাও ঠিক নয়। আর যদি প্রমাণ করতে পারো যে, তুমি সত্যিই প্রতিভাবান ক্রিকেটার, মা-বাবাও তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। আসলে, এখনও ওঁরা তোমার পাশেই আছেন, তোমার ভবিষ্যৎটা আরও সুরক্ষিত করতে চাইছেন। চেষ্টা ছেড়ো না, ভাগ্য তারই সহায় হয় যে চেষ্টা চালিয়ে যায়।

ফেস্ট, নতুন কোর্স, ক্যান্টিন, আড্ডা সবই থাকবে এই পাতায়

ক্যাম্পাস



জামালপুর হাই স্কুল
মোল্লারপুর, বীরভূম



আমাদের বিদ্যালয়

▶▶বীরভূমের ময়ূরেশ্বর-১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয় আমাদের প্রিয় স্কুল। এই অঞ্চলের অন্যতম সেরা আমাদের স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। তার চেয়েও যা বেশি উল্লেখযোগ্য, তা হল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক। তাঁরা আমাদের বড় কাছের মানুষ। আমরা তাঁদের স্নেহ ও ভালবাসা পেয়ে মুগ্ধ। তাঁদের সাহায্যে ও শিক্ষায় আমরা প্রত্যেকে জীবনে সফল হব, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সর্বশিক্ষা অভিযান

▶▶বীরভূম জেলা জুড়ে চলছে সর্বশিক্ষা অভিযান। আমরাও সেই আন্দোলনের শরিক। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে জনসচেতনতা পদযাত্রায় আমরা সকলে অংশ নিই। আমাদের অঙ্গীকার, অঞ্চলের প্রতিটি শিশুকে আমরা স্কুলশিক্ষায় শামিল করব। যে সমাজে প্রতিটি মানুষ শিক্ষার সুযোগ পায় সেই সমাজের উন্নতি নিশ্চিত। আমরাও চাই, সকলের জন্য শিক্ষার কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে।

সীমা মণ্ডল ও অমিতাভ রায়, *ষষ্ঠ শ্রেণী*



সবুজের ডাক

▶▶আমাদের স্কুলে সি ভি রমনের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইকো ক্লাব। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য স্থানীয় মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক ও পরিবেশসচেতন করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে আমরা বিজ্ঞানদিবসে সচেতনতা পদযাত্রা করে সুস্থ পরিবেশ গড়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানাই। এ ছাড়া সারা বছর জুড়ে আরও নানা কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি। আমাদের এই কর্মসূচিগুলি সফলভাবে রূপায়িত হলে আমরা পাব সুস্থ পরিবেশ ও বিজ্ঞানমনস্ক এক সমাজ।

শ্রীমন্ত প্রামাণিক, *অষ্টম শ্রেণী*

বিদায় সংবর্ধনা ও আমাদের দেওয়াল পত্রিকা

▶▶দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর দাদাদিদিদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রতি বছর তাদের পরীক্ষার আগে। বিষাদঘন পরিবেশে তাদের বিদায় দিতে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রাণ কাঁদে।

নিয়মিত দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ আমাদের স্কুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতিমধ্যে এ-বছরে বিশেষ স্বাধীনতা সংখ্যা, শীত সংখ্যা ও ভৌতিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। লেখালেখিতে আমাদের হাত পাকাবার জন্য এই পত্রিকা খুব উপযোগী। এ থেকে বাছাই করা রচনাগুলি বিদ্যালয়ের মুদ্রিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অমর পাল, *ষষ্ঠ শ্রেণী*

কুইজ

২৪ এপ্রিল ৩০ বছরে পা দিচ্ছেন স্যার ডনের উত্তরসুরি মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর। এবারের কুইজ ক্রিকেটের এই বিস্ময়কর প্রতিভাকে নিয়ে।



উত্তর আগামী সংখ্যায়

১. টেস্ট ও একদিনের ক্রিকেট, উইজডেনের দুটি তালিকাতেই সর্বকালীন সেরাদের মধ্যে সচিনের নাম দু'নম্বরে। টেস্টে ডন ব্রাডম্যানের পরেই আছেন তিনি। একদিনের সেরাদের তালিকায় কার পরে তাঁর নাম?

২. ১৯৮৯-'৯০ মরসুমে পাকিস্তানের বিপক্ষে সচিন খেলেন তাঁর প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ওই ম্যাচেই অভিষেক হয়েছিল এক বিখ্যাত পাকিস্তানি ফাস্ট বোলারের। কে তিনি?

৩. ১৯৯০-'৯১ মরসুমে প্রথম বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে ইংল্যান্ডের কোন কাউন্টির হয়ে খেলেন সচিন?

৪. সারদাশ্রম স্কুলের হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্সের বিরুদ্ধে সচিন-কাম্বলির করা অপরাজিত ৬৬৪ আজও বিশ্বরেকর্ড। কাম্বলি করেন অপরাজিত ৩৪৯। সচিন কত রানে অপরাজিত ছিলেন ওই ম্যাচে?

৫. সচিনের বড় হয়ে ওঠা নিয়ে কে লিখেছেন 'দ্য মেকিং অব আ ক্রিকেটার' বইটি?

৬. কিছুদিন আগে মুম্বইয়ে চালু হল সচিনের রেস্তরাঁ। কী নাম সেটির?

৭. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কার বলে সবচেয়ে বেশিবার আউট হয়েছেন সচিন?

৮. আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে আউট ঘোষিত হওয়া প্রথম ব্যাটস্‌ম্যান তিনি। সেই খেলায় তৃতীয় আম্পায়ার কে ছিলেন?

গত সংখ্যার উত্তর:

১. রুজভেল্ট হোটেল।
২. 'উইংস'।
৩. সেরা চিত্রনাট্য।
৪. মার্লন ব্র্যান্ডো।
৫. 'অল অ্যাবাউট ইভ' (১৯৫০)।
৬. বস অ্যান্ড লম্ব। এরা রে-ব্যান সানগ্লাস তৈরি করে।
৭. চার্লি চ্যাপলিন।
৮. মার্লি ম্যাটলিন। ২১ বছর বয়সে।

অভিজিৎ সুকুল ও তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

জবাব চাই

১. সচিনের মেয়ের নাম সারা। ছেলের নাম কী?

২. ব্রাডম্যানের ৯০তম জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় সচিনের সঙ্গে ছিলেন কোন বিখ্যাত অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার? শেন ওয়ার্ন

৩. বিখ্যাত এক সঙ্গীতশিল্পীর নামে রাখা হয়েছিল সচিনের নাম। কে তিনি? শচীনদেববর্মন

২০ মার্চ সংখ্যার জবাব চাইয়ের সঠিক উত্তর:
১. সবুজ। ২. উজ্জ্বল কমলা। ৩. সলিম আলি।

সঠিক উত্তরদাতা:
অজিতকুমার বসাক, বেলানগর, হাওড়া; অর্কপ্রভ গঙ্গোপাধ্যায়, চুঁচুড়া, হুগলি; সুদীপ্ত ঘোষ, কলকাতা ৮; নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ৮৪; সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর, হুগলি।

মুখে sorry নয় sorry বলো মনে

বারবার ভুল করে দুঃখপ্রকাশ কোরো না, বেশি ব্যবহারে সবকিছুতেই মরচে পড়ে যায়। জানিয়েছেন

তরুণকুমার রায়

বেশ কিছুদিন ধরে মায়ের খুব পরিশ্রম যাচ্ছে। পিয়ালের স্কুল, বাবার অফিস সামলেও নিয়ম করে মামারবাড়ি যেতে হচ্ছে মাকে। ছোটদাদু, মানে মায়ের কাকা খুব অসুস্থ, তাই ডাক্তারের কাছে যাওয়া বা ওষুধপত্র এনে দেওয়ার কাজটা মাকেই করতে হয়। সেদিন বিকেলে মা বাজারে বেরিয়েছেন, স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেতে খেতে এম টিভি দেখছিল পিয়াল। হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল ফোনটা। "পিয়াল, মা ফিরলে সঙ্গে সঙ্গে মামার বাড়িতে ফোন করতে বলবি। খুব জরুরি দরকার আছে।" হুড়মুড়িয়ে কথাগুলো বলেই ফোন রেখে দিলেন দিদা। একটু পরেই ঝড় উঠল, মা বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই নামল বৃষ্টি। বাবা ফেরার পর পড়তে বসতে হল। এত সব তালেগোলে দিদার ফোনের কথাটাই খেয়াল ছিল না পিয়ালের। রাতে খেতে বসে যখন মনে পড়ল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অনেকবার "সরি মা" বলে কথাটা মাকে জানাল বটে, কিন্তু নিজেই বুঝল যে ব্যাপারটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মামার বাড়িতে ফোন করে জানা গেল ছোটদাদুকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে।

'সরি', 'ভুল হয়ে গেছে', 'আমি এভাবে তোমায় হার্ট করতে চাইনি' বা 'আর কখনও এরকম করব না'। কথাগুলো আমরা বারবার বলি। কিন্তু মন থেকে বলি কি? মনে রেখো, মন থেকে না বললে কিন্তু কোনও দামই নেই কথাগুলোর। পিয়ালের মতো ভুল কখন হয় জানো? যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কারও কথা না শুনলে। কেউ যখন কিছু মনে রাখতে বলছেন, তখন সেটা ভুলে যাওয়ার অর্থ, ব্যাপারটা যথেষ্ট ইমপর্ট্যান্ট না ভাবা। শুধু যে তিনি অপমানিত হলেন, তাই নয়, এর ফলে বড় কোনও ক্ষতিও হতে পারে, ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনাও। তখন হাজারটা 'সরি' বললেও কাজের কাজ হবে না। রাস্তায় কাউকে ধাক্কা দিয়ে বা কারও পা মাড়িয়ে দিয়ে সরি বলে নির্বিকারভাবে চলে গেলেও একইরকম ঔদ্ধত্য এবং অভব্যতা প্রকাশ পায়।

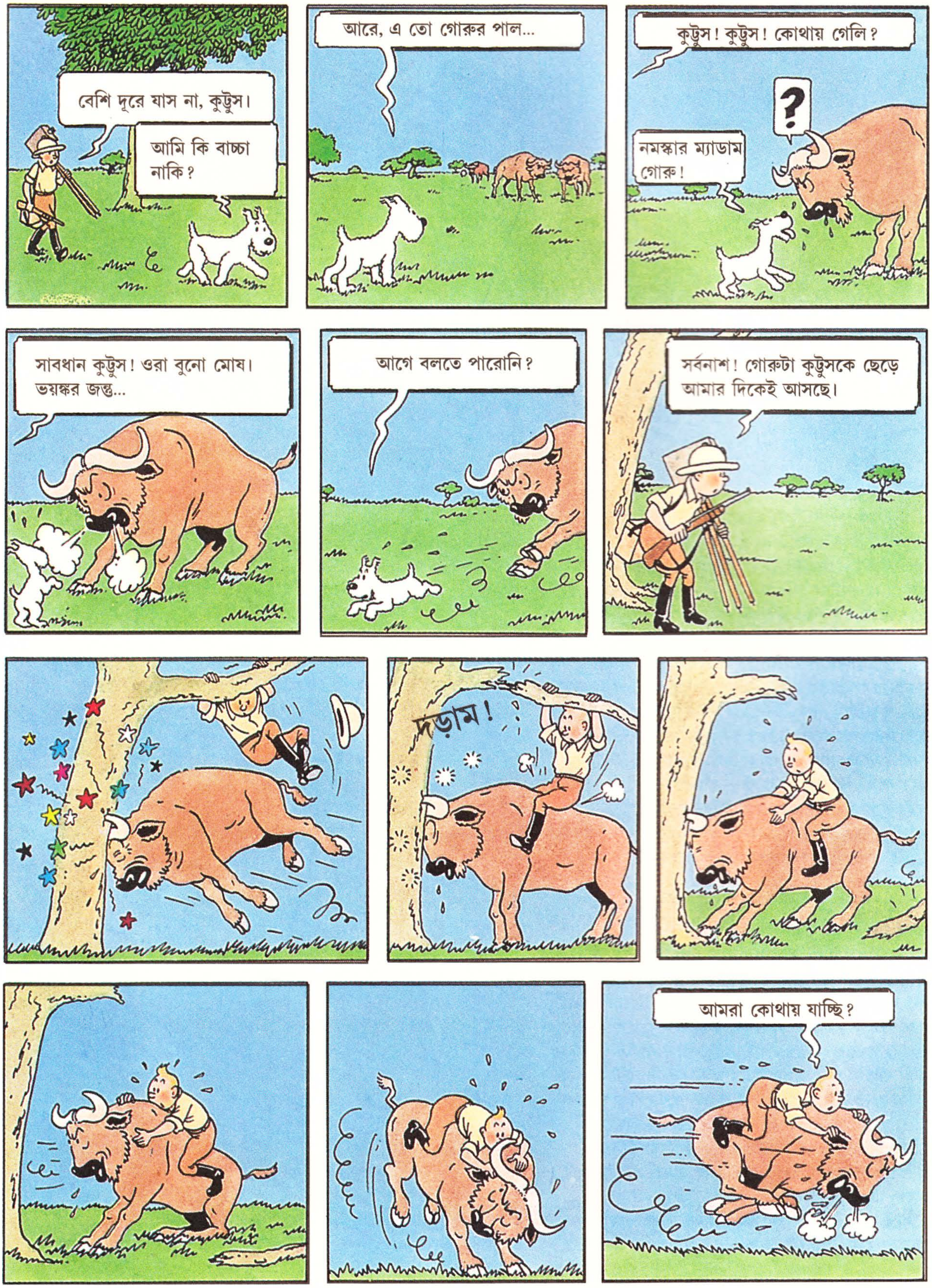
ধরো, প্রতি রাতে বাড়ির দরজাটা বন্ধ করার কাজটা তোমার। তুমি রোজ রাতেই কাজটা করতে ভুলে যাও, আর বাবা মনে করিয়ে দিলে দায়সারাভাবে 'ভুল হয়ে গেছে' বলে কাজটা করে দাও। এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, কাজটা করতে তোমার ভাল লাগে না এবং বাবার কথাগুলোও তুমি সিরিয়াসলি নাও না। ভেবো না যে, সরি তো বলেইছি, আবার কী করব? প্রতিদিন একই ভুল কারও হতে পারে না, নিজের ভুল শোধরাবার চেষ্টা করো। না হলে অনেক কাছের মানুষ দূরে সরে যাবেন।

পারমিতা আর সন্দীপের ঝগড়া হয়ে গেছে দিনকয়েক আগে। নিজের জন্মদিনে সন্দীপ সব প্রিয় বন্ধুবান্ধবীকে খাওয়াতে নিয়ে যায় প্রতি বছর। লাঞ্চ ব্রেকে কলেজের কাছাকাছি রেস্তরাঁয় সবাই মিলে যাবে, এমনটাই ঠিক করে রাখা ছিল। পারমিতাকে ডাকতেই ও মুখের উপর বলে দিল, "সরি রে, শরীরটা ঠিক নেই, আজ যাব না।" এভাবে সরি বলে কাউকে প্রত্যাখান করাও যায়, তাতে তোমার অভিমানটাই প্রকাশিত হয়। বন্ধুদের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগতে পারে, তবে বড়দের এভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। তাতে আবার তাঁরা অপমানিত হতে পারেন।

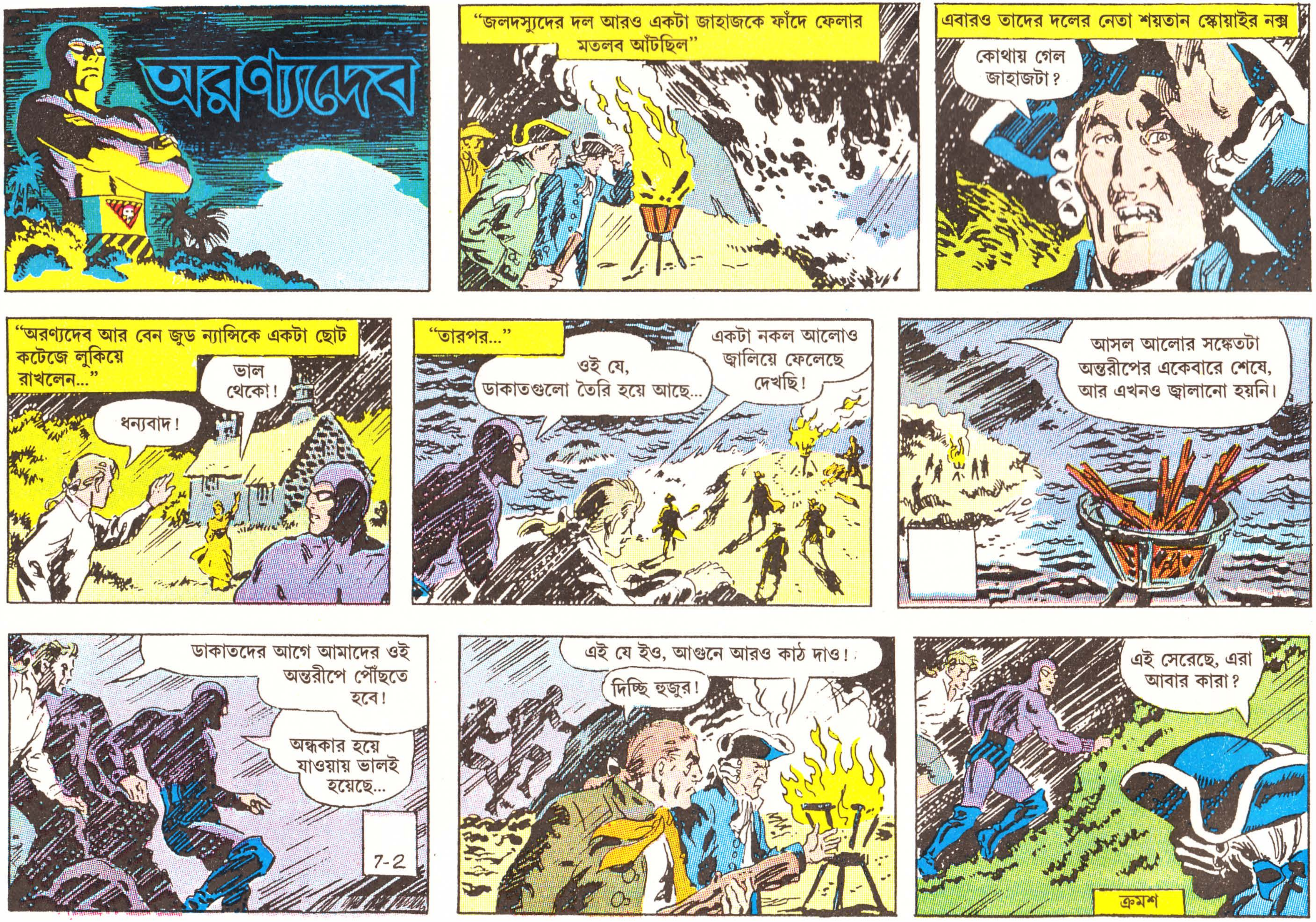
একটা গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করা যাক। এক রাজা যখন খেতে বসেন, তখন প্রতিদিন তাঁর সামনে বসে থাকে ভাঁড়। সে নানারকম হাসির কথা বলে রাজার মন ভাল রাখে। একদিন ভাঁড়কে না ডেকেই রাজা খেতে বসে গেছেন, ভাঁড় এসে জানতে চাইলেন, "আমায় ডাকেননি কেন?" রাজা বললেন, "সরি।" ভাঁড় খুব আত্মবিশ্বাসী গলায় বললেন, "এই কথাটার কোনও মানেই নেই।" রাজা জানতে চাইলেন, "কেন?" ভাঁড় রাজাকে একটা চড় মারলেন। হতবাক রাজা তখনও বুঝে উঠতে পারেননি ব্যাপারটা। ভাঁড় হেসে বললেন, "সরি, ভুল করে ফেলেছি, আর কখনও হবে না।" তারপর খানিক পরে বললেন, "দেখলেন তো, সরি বলে সবরকম অন্যায় করে ফেলা যায়।"

বলতে হয় বলেই সবসময় 'সরি' বোলো না, তা হলে কারও সহানুভূতি পাবে না। যদি কখনও আন্তরিক দুঃখ পাও বা সত্যিই অনুশোচনা হয়, একমাত্র তা হলেই ব্যবহার করো এই প্রেশাস শব্দটা।

টিনটিন ★ হার্জে   কঙ্গোয় টিনটিন

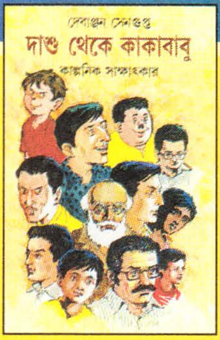


(এর পরে আগামী সংখ্যায়)


অরণ্যদেব
"জলদস্যুদের দল আরও একটা জাহাজকে ফাঁদে ফেলার মতলব আঁটছিল"
এবারও তাদের দলের নেতা শয়তান স্কোয়াইর নক্স
কোথায় গেল জাহাজটা?
"অরণ্যদেব আর বেন জুড ন্যান্সিকে একটা ছোট কটেজে লুকিয়ে রাখলেন..."
ভাল থেকো!
ধন্যবাদ!
"তারপর..."
ওই যে, ডাকাতগুলো তৈরি হয়ে আছে...
একটা নকল আলোও জ্বালিয়ে ফেলেছে দেখছি!
আসল আলোর সঙ্কেতটা অন্তরীপের একেবারে শেষে, আর এখনও জ্বালানো হয়নি।
ডাকাতদের আগে আমাদের ওই অন্তরীপে পৌঁছতে হবে!
অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ভালই হয়েছে...
7-2
এই যে ইও, আগুনে আরও কাঠ দাও!
দিচ্ছি হুজুর!
এই সেরেছে, এরা আবার কারা?
ক্রমশ

বই

ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে



দাশু থেকে কাকাবাবু
কাল্পনিক সাক্ষাৎকার
দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
দাম : ১০০ টাকা

নামের মধ্যে দিয়েই পরিষ্কার যে, বইটি মূলত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক। কিন্তু সেটাই সব নয়, এই বইয়ের আসল চমক লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়। বাংলা সাহিত্যের যে চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় না হলে বাঙালি ছেলেমেয়েদের কৈশোর সম্পূর্ণ হয় না, সেই চরিত্রগুলিকে লেখক দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত দক্ষতার সঙ্গে আর একবার জীবন্ত করে তুলেছেন। সেই তালিকা থেকে যেমন বাদ যায়নি সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবাদপ্রতিম চরিত্র টেনিদা বা টেনিদার গুরু প্রেমেন্দ্র মিত্রর ঘনাদা, তেমনই হাজির আছেন একালের কিশোর-কিশোরীদের চোখের ঘুম কেড়ে নেওয়া প্রোফেসর শঙ্কু, ফেলুদা এবং কাকাবাবু। আছেন জয়ন্ত-মানিক, হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন, ভোম্বল সর্দার এবং কিরীটি রায়। প্রারম্ভিক আভাসে লেখক জানিয়েছেন, ছোট-বড় সকলের কাছেই সমান আবেদনপূর্ণ, এমন চরিত্রগুলিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন। হাতের কাছে প্রোফেসর শঙ্কু বা টেনিদার বই পেলে উলটে দেখবেন না, এমন মানুষ বিরল। কিশোর-কিশোরীদের চিরকালের দুষ্টুমি, মজা, রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয়তাকে পুঁজি করে দাশু, টেনিদা, ফেলুদা, কাকাবাবুদের ইন্টারভিউ করেছেন লেখক। এঁদের কাহিনী পড়তে পড়তে ছেলেমেয়েদের মনে যে প্রশ্নগুলো ওঠা খুব স্বাভাবিক, কাল্পনিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সেগুলোরই উত্তর খোঁজা হয়েছে। এক-একটি চরিত্রকে নিয়ে লেখা শুরু করার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। দাশু, হর্ষবর্ধন, টেনিদাকে তিনি গিয়ে ইন্টারভিউ করেছেন, কিরীটি রায়ের বেলায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যম বদলে হয়েছে অডিও-ভিশুয়াল। অপুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত দেখা হয়নি তাঁর। অন্যদিকে ফেলুদা তো নিজের ইন্টারভিউ দিতে রাজি হওয়ার আগে রীতিমত পরীক্ষা নিয়েছেন লেখকের। যদিও সবই কাল্পনিক, কিন্তু বইটি পড়তে পড়তে ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট আনন্দ পাবে।

মনীষা দাশগুপ্ত

গল্পকথায় প্রাণীদের জীবন



কিংবদন্তী প্রাণীদের কথা
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
৯৩এ, লেনিন সরণি
কলকাতা-৭০০ ০১৩
দাম : ৪৫ টাকা

সারা পৃথিবীর ৫১টি স্থলচর, জলচর, খেচর ও উভচর প্রাণীকে তাদের নিয়ে গড়ে ওঠা কিংবদন্তি এবং প্রকৃতির বিজ্ঞাননিষ্ঠ পরিচয় জানিয়েছেন অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর এই বইয়ে। জীববৈচিত্র্যের অনুসন্ধান ও তার সংরক্ষণে একসময় মানুষ সচেষ্ট ছিল, যার জন্য নানারকমের কিংবদন্তি প্রচলিত হয়েছিল। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অরণ্যনিধন, প্রাণীনিধন মেনে নেওয়া যায় না। জীবজগৎকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের ছোটবড় সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। গল্পের মোড়কে প্রাণীদের বিবরণ পড়ে পাঠক তৃপ্ত হবেন, তাদের প্রতি সম্ভ্রম জাগবে তাঁদের।

জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাস



বইয়ের বাড়ি বেলভেডিয়ার
শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী
প্রিটোনিয়া
১৪, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
দাম : ৭০ টাকা

১৯৫৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার আলিপুরে বেলভেডিয়ার বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় জাতীয় গ্রন্থাগার। এখানে প্রায় ২৫ লক্ষ পুঁথিপত্র নিয়ে যেসব শেল্ফ আছে, সেগুলো পরপর সাজিয়ে দিলে ৩২ মাইল লম্বা একটি সরলরেখা টানা সম্ভব। দেশবিদেশের গবেষক, গ্রন্থপিপাসুদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে পারে বেলভেডিয়ারের এই বাড়ি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির সূত্রে এর যাত্রা শুরু হয় কলকাতার গঙ্গাপারের মেটকাফ হল থেকে। ৩০ জানুয়ারি, ১৯০৩ তারিখে। জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত নিয়ে বাংলায় এই বইটি লিখেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান অধিকর্তা শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী। যারা এখনও এখানে যায়নি তারা এবং যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা, সকলেই আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়বেন। সঙ্গের দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি কিন্তু উপরি পাওনা।

বিমলকুমার পাল

ডাকটিকিটের পৃথিবী



ডাকটিকিটের কথা ও কাহিনী
শোভেন সান্যাল
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১২
দাম : ১২০ টাকা

বিশ্বের প্রথম ডাকটিকিট যে 'পেনি ব্ল্যাক', তা হয়তো অনেকেই জানেন। কিন্তু ডাকটিকিটের জগৎ যে কী বিশাল আর কী কৌতূহলজনক, তার খোঁজ সংগ্রাহকরা ছাড়া আর কেউ বড় একটা রাখেন কি? অনেকেই রাখেন না, কিন্তু এমন চমৎকার একটি বই হাতে পেলে মনে হয় এখন থেকে তাঁরাও হয়ে উঠবেন ডাকটিকিটের সমঝদার। সারা পৃথিবীর অসংখ্য বিখ্যাত ডাকটিকিটের গল্প সহজ অথচ মনোগ্রাহী ভাষায় শুনিয়েছেন লেখক। তাঁর বর্ণনায় জায়গা পেয়েছে আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের প্রথম ডাকটিকিট, টুয়েল্ভ পেন্স ব্ল্যাক, মহাত্মা গাঁধীকে নিয়ে প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট ও আরও অনেক কিছু। আছে ডাকটিকিটের ইতিহাসের নানা টুকরো ছবি জুড়ে তৈরি এক আশ্চর্য ইতিহাস। এ এমন এক ইতিহাস যেখানে তথ্যের ভার পাঠককে ক্লান্ত করে না, বরং বইটি পড়তে পড়তে আমরাও যেন হয়ে উঠি লেখকের সহযাত্রী। তবে আরও ভাল হত, যদি স্ট্যাম্পগুলির রঙিন ছবি থাকত বইটিতে। ডাকটিকিটের মতো রংচঙে সম্পদ কি সাদা-কালোয় মানায়?

অভীক ভট্টাচার্য

ওলটপালট

পাশে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি।

বারেখারঘ

রিলাগেসৈন্য

এবারে পাশের গোলচিহ্নের ভিতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে পাশের কার্টুন-ছবির সংকেতের সমাধান।

সারগবেলায়

দুলদুর্বামুশ্যা



দূরের পানশালার সন্ধানে নেশাগ্রস্ত মানুষ যেভাবে এগোয়

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

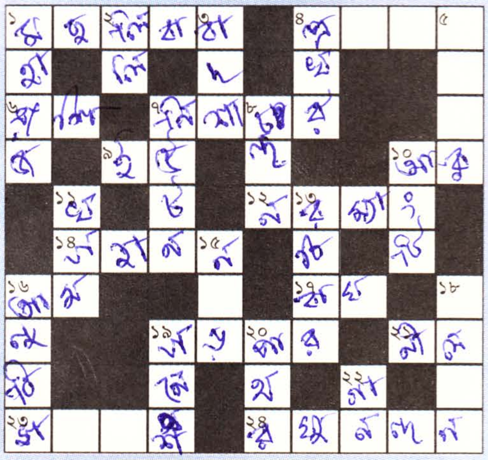
দু'টি ষাঁড়ের সম্মুখসমরে পরাজিত ষাঁড়টির যা দশা হল — লে জে গো ব রে

গত সংখ্যার সঠিক শব্দ: ইত্যবসরে, তেলেবেগুনে, ভূগোলশিক্ষক, জেনানাফাটক।

ঘোষক

শব্দসন্ধান

বিষয় : সত্যজিৎ রায়



সংকেত: পাশাপাশি

(১) 'জয় বাবা ফেলুনাথ' সিনেমায় ফেলুদা যার ছদ্মবেশ নেয়। (৪) 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ মহেশ চৌধুরির শখ ছিল এটা সংগ্রহ করা ; রঙিন ডানার পতঙ্গ। (৬) 'যার ভাণ্ডারে রাশি — সোনাদানা ঠাসাঠাসি।' (৭) লেখার জগতে লালমোহনবাবুর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষিতীশ চাকলাদারের ছদ্মনাম ; রাতে বিচরণকারী। (৯) তাঁর লেখা 'প্রোফেসর শঙ্কু ও —. এফ. ও.'। (১০) '— আছে পোলাপান, একখান।' (১২) 'অভিযান' ছবির অবাঙালি চরিত্র ; প্রথম জোড়ায় মানুষ। (১৪) 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও' গল্পে খলনায়ক 'তরফদার' যেন গণেশ! (১৬) বিজ্ঞানী শঙ্কু কমলালেবুর সঙ্গে যা মিশিয়ে আবিষ্কার করেছেন 'আমলা' ফল। (১৭) 'পায়ে পড়ি — মামা।' (১৯) কলকাতার যে অঞ্চলে সত্যজিৎ রায়ের জন্ম। (২১) শঙ্কুর ডায়েরির মলাটের রং কী? (২৩) 'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য' গল্পে 'কোহিনুর পিকচার্স'-এর 'মল্লিক' ডিস্ট্রিবিউটর ; প্রথম দু' ঘরে গানের মাত্রা! (২৪) 'ডাঃ মুনসির ডায়েরি'তে 'আর' (R) বলতে যাকে বোঝানো হয়েছে, যেন রামচন্দ্র।

উপর-নীচ

(১) '— তোমারে সেলাম।' (২) 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর'-এ ফেলুদার হাউসবোটের নাম 'ওয়াটার —'। (৩) ফেলুদা-কাহিনিতে বনবিহারীর পোষা কুকুরের নাম। (৪) ইনি জটায়ুর ডিটেকটিভ ; 'রুদ্র' যার পদবি। (৫) 'জবর জবর —'। (৭) শঙ্কুর পোষা বিড়ালের নাম ; এ নামে 'আইজ্যাক' বিজ্ঞানী! (৮) 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ দু'জন বাঘের ট্রেনারের একজন ; লেজ কাটলে চাঁদ! (১০) 'বাদশাহী —'। (১১) ইমলিবাবার সাপ নিয়ে সত্যজিতের গল্প। (১৩) 'সোনার কেল্লা'য় তোপসের বাবা সপ্তাহের যেদিন সুবিমলকাকার বাড়ি আড্ডা মারতে যান। (১৫) শঙ্কু-কাহিনিতে এ বাবু মাকড়দা-নিবাসী, নিয়মিত ব্রাহ্মীশাক খান। (১৬) 'শেয়াল দেবতা রহস্য'তে মিশরীয় দেবতা। (১৮) 'গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস' থেকে পালিয়ে যাওয়া বাঘ ; ঠিক যেন 'বাদশাহ'! (১৯) 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ হদিস করা মূর্তি। (২০) মাথায় 'পরশ' করলেই মানিক চিত্র! (২২) 'হবে হবে হবে হবে — হবে ঢোল হবে।'

স্নেহাশিস কুমার

গত সংখ্যার সমাধান

জ	ন	ডে	ভি	স	ন		না		গ্রে
ন		ভ		হ			সে	লি	ম
রি				বা	ক	না	র		হি
ড	ট		লে	গ					ক
	মা		ম্যা		ডা	র	বা	ন	
	স	দা	ন	ন্দ		জা		য়	
লা					হা	র		ন	ট
র		ও	য়া	ই	ড				ম
কি	নি	য়া			স		উ		স
ন্স		র্ন		ড	ন	ব্রা	ড	ম্যা	ন

প্রোফাইল



মণির নতুন ছবি

◆◆অনেকদিন পর আবার হিন্দি ফিল্ম তৈরি করার কথা ভাবছেন মণিরত্নম। যতদূর জানা গেছে, ছবিটির গল্প কয়েকজন কমবয়সী ছেলেমেয়েকে নিয়ে। মহানগরে নিজেদের স্বপ্নকে সফল করার জন্য কতটা চেষ্টা করতে হয় সদ্য লেখাপড়া শেষ করে কলেজের বাইরে পা রাখা ছাত্রছাত্রীদের? স্টোরি লাইন ঘোরাফেরা করবে এই থিমেরই চারপাশে। যতদূর জানা গেছে, বিবেক ওবেরয় আর অভিষেক বচ্চন রাজি হয়েছেন লিড রোলে অভিনয় করতে। তৃতীয় চরিত্রটির জন্য বাছা হয়েছিল হৃতিক রোশনকে, কিন্তু তিনি অফারটি ছেড়ে দেওয়ায় এই চরিত্রের জন্য একজন অভিনেতার খোঁজ চলছে। নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে টিনএজারদের হার্টথ্রব করিনা কপূরকে। **ফোটো: অরণ্য সেন**

নিলামে বেঠোফেন

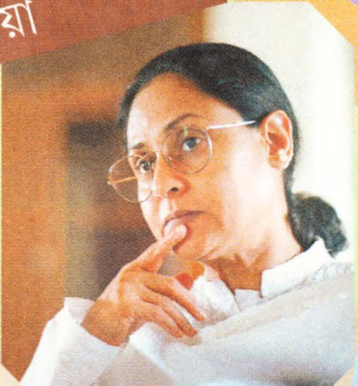
◆◆লন্ডনের সথবি নিলামঘর খুব শিগগিরই বিক্রি করবে বেঠোফেনের ওরিজিনাল পাণ্ডুলিপি। তিনটে বাঁধানো ভল্যুমে, ৪৬৫ পাতায় পাওয়া যাবে বেঠোফেনের মিউজিকের খসড়া, এর মধ্যে আছে দারুণ জনপ্রিয় 'নাইনথ সিমফনি'-ও। বিশেষজ্ঞদের মতে, সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য এবং 'কমপ্লিট' বেঠোফেন পাণ্ডুলিপি এটাই। সথবি কর্তৃপক্ষের ধারণা, মোটামুটি তিন থেকে চার মিলিয়ন ডলার দাম উঠবে পাণ্ডুলিপিটির।



Bond with ঐশ্বর্য

◆◆সব কিছু ঠিকঠাক চললে এমনটাই হওয়ার কথা। বন্ডের বিপরীতে এর আগে কোনও ভারতীয় নায়িকা অভিনয় করেননি। ঐশ্বর্য রাইয়ের কাছে অফারটি নিয়ে এসেছেন একটি আন্তর্জাতিক কাস্টিং এজেন্সির প্রতিনিধিরা, তাঁরা অপেক্ষা করছেন আহত ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। কিছুদিন হল সময়টা ভাল যাচ্ছে না প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ডের। 'খাকি' ছবির শুটিং চলাকালীন পায়ে আঘাত পেয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনা জায়গা করে নিয়েছে খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। সলমন খানের সঙ্গে একসময়ে ভাল সম্পর্ক ছিল তাঁর। সেই জের টেনেই সলমন চূড়ান্ত অপমান করেছেন ঐশ্বর্যের বন্ধু এবং সহকর্মী বিবেক ওবেরয়কে। সলমন বিষয়ে তাঁর তিক্ততা এতটাই যে, মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এক নম্বর নায়িকা প্রেসকে ডেকে জানিয়েছেন, সলমনের সঙ্গে ব্যক্তিগত বা প্রফেশনাল — কোনওরকম সম্পর্কই নেই তাঁর। আশার কথা হল, এত বিপর্যয় সত্ত্বেও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে ঐশ্বর্যের আলো। দু'টি বিদেশি ছবিতে তিনি কাজ করবেন বলে মোটামুটি ঠিক হয়েছে, একটি গুরিন্দর চাড্ডার 'ব্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস', এবং অন্যটি রোলান্ড জফের 'দ্য ইনভেডার্স'। **ফোটো: ডব্বু রত্নানি**

নবরূপে জয়া



◆◆জয়া বচ্চন এবং বাংলা ছবি। এক্সাইটেড হয়ে ওঠার মতো কম্বিনেশন। এটা সত্যি যে, জয়া আবার ফিরছেন টালিগঞ্জে, তবে নায়িকা হিসেবে নয়, প্রোডিউসার হয়ে। জয়া 'পৃথ্বী' নামে একটি নির্বাক ছবি বানাবেন, পরিচালনা করবেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়। মূল চরিত্র দু'টি এবং তাদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা চালানোর মতো সম্পর্ক নেই। ডিফারেন্ট, তাই না? **ফোটো: তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

এন্টার কিং কং

◆◆'লর্ড অব দ্য রিংস'-এর পরিচালক পিটার জ্যাকসন ব্লকবাস্টার 'কিং কং' ছবিটি রিমেক করবেন। ঠিক হয়েছে ২০০৪-এর মাঝামাঝি শুরু হবে শুটিঙের কাজ। মুশকিল হচ্ছে নায়িকা বাছতে গিয়ে। প্রথম ছবিতে নায়িকা ছিলেন ফে রে। তাঁর অসাধারণ অভিনয়ের পর বেশ জোলো দেখিয়েছিল ১৯৭৬-এর রিমেকে জেসিকা ল্যাঙকে। পরিচালক খুঁজছেন এমন এক নায়িকা, যিনি বিরাট চেহারার গোরিলার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ চিৎকার-চেঁচামেচি করতে পারবেন!

রুদ্রাণী ভট্টাচার্য


SAMSUNG
SAMSUNG
RANG DE KISMAT Offer*
What is your lucky colour?**
Buy any Samsung Frost-free refrigerator and win thousands of gifts!*
Bio
RED
Tanishq Gift Voucher worth Rs. 30,000/-
GIFT VOUCHER
TANISHQ Rs. 30,000/-
Bio
BLUE
Set of 15 Storage Devices*
*Product visual shown is indicative. Actual product may vary.
Bio
ORANGE
Samsung Mobile Phone N-500
Bio
GREEN
Samsung Microwave Oven M1739
Bio
PINK
Gift Hamper from Avon
Simply follow these instructions and claim your gift:
• Check the sticker on the carton for any indication of tampering
• Take out the special glass
• Pour cold water into the glass
• Wait till the marking on the glass changes colour
• Claim your gift based on the colour you see
• In order to claim the gift won simply fill in the redemption coupon and give it to the Samsung dealer.
* Terms & conditions apply. Offer valid from 21st March, 2003 to 31st May, 2003.
** Colours shown are representative of the actual colour. The decision of the Samsung office with regard to the colour & the gift won will be final & binding on all customers.

ANANDAMELA 20 APRIL 2003 REGD NO. MM&PO/WB/RNP/183/2003 &
MM&PO/WB/RNP/FGN-03/2003 Tech/47-550/MBI/2003-05. RNI NO. 27057/75 Rs. 10.00

